পরাজয়ের সাক্ষী

সিদ্দিক সালিক

লেখক ৭১ সালে ছিলেন পাক-বাহিনীর জনসংযোগের মূখ্য ব্যাক্তি। পুরো একাত্তর সাল প্রত্যেকটি প্রধান সংবাদপত্র অফিসে তার ভারী বুটের শব্দ আতংকের সৃষ্টি করেছে-প্রতিদিনই তিনি সংবাদপত্রের সম্পাদককে টেলিফোনে নির্দেশ দিয়েছেন। যুদ্ধের ওপর ভারতীয় ও পাকিস্তানের সমর নেতাদের বই বেড়িয়েছে অনেকগুলো-এটি তারই একটি। উইটনেস টু সারেন্ডার নামের এই বইতে পাকিস্তানি পক্ষের অনেক কথা পাওয়া যায়-যা একান্তভাবেই পাকিস্তানি প্রেক্ষিত- তা সত্বেও ঐতিথাসিক দলিল হিসেবে চারটি অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশ করা হলো।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্যঃ ভারতীয় সমর নায়করা ৭১ সাল নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন, পাকিস্তানিরা লিখেছেন কয়েকটি। দুপক্ষই আত্মপক্ষের কথা বলেছেন। একজন লিপিবদ্ধ করেছেন বিজয়গাথা একজন দিয়েছেন পরাজয়ের সাক্ষ্য।

দুপক্ষের লেখা থেকে তৃতীয়পক্ষের কথা কিছু জানা যায়। এই তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর কোন প্রধান ব্যাক্তি আত্মপক্ষের কথা লেখেননি। লেখেননি বলেই দুপক্ষের লেখা থেকে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান নিরুপণের চেষ্টা করা হয়।

লেখক ১৯৮৮ সালের ১৭ই আগস্ট এক রহস্যজনক বিমানদূর্ঘটনায় তৎকালীন পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক'র সাথে নিহত হন।

-সম্পাদক

বিদ্রোহ

ভারত কেন মার্চের শেষে বা এপ্রিলের গোড়ার দিকে আমাদের চরম অরক্ষিত অবস্থায় আমাদের ওপর সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ গ্রহন করেনি? ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ভারতীয় সরকারী ইতিহাসকর মেজর জেনারেল ডি কে পালিত বলেছেন ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান সে দায়িত্ব গ্রহন করতে এই কারনে অস্বীকৃতি জানান যে সশস্ত্র বাহিনী তখনই সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত হবার প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়োজিত ছিল। জেনারেল পালিত জানান, ৫০০০ কোটি রুপি ব্যায়সাপেক্ষে পঞ্চবার্ষিক প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তখন বাস্তবায়িত হচ্ছিলো এবং ভারতের সামরিক শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলবার প্রয়োজনে আরও অনেক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় ছিল। তিনি বলেনঃ

সেনাবাহিনীতে জনশক্তির যোগান তখনই পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি এবং অনেক ইউনিট তখনও ছিল দূর্বল। কয়েকটি সাজোয়া রেজিমেন্ট পুরোপুরি গড়ে তোলা ও সুসজ্জিত করার কাজ তখনও শেষ হয়নি। সুষ্ঠু তৎপরতা চালাবার জন্য আবশ্যিক প্রশাসনিক ও লজিষ্টিক ইউনিটের নানান সীমাবদ্ধতা দূর করা হয়নি। বিমান বাহিনীতে জঙ্গী বিমান মিগ-২১ এর উৎপাদন কার্যক্রম পুরোদমে শূরু হয়নি এবং খুচরো যন্ত্রপাতির অভাবে বিমান বহরের কর্মক্ষমতা ছিলো নিম্নপর্যায়ের। নৌ-বাহিনীর ক্ষেত্রেও পুনঃসজ্জার কর্মসূচি তখনও শেষ হয়নি। সশস্ত্রবাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে পূর্নভাবে প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে জরুরী কার্যক্রম গ্রহনের জন্যে আরও কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন ছিলো। তার চাইতে গুরুতর ব্যাপার ছিল যে অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার চাহিদার কারনে সেনাবাহিনীর মধ্যে শক্তির ভারসাম্যে বিপর্যস্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের দুই ডিভিশন সৈন্য (ভারী অস্ত্র ছাড়া) এবং নাগাল্যান্ড ও মিজো পার্বত্য এলাকায় এক ডিভিশন করে সৈন্য মোতায়েন করা হয়। বাংলাদেশে হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে কোন ঘাটি নির্মান না করায় এই পর্যায়ে আকাশ যুদ্ধের অস্ত্র ব্যবহার অসম্ভব হয়ে উঠে। শিলচরে কুড়িগ্রাম বিমান ক্ষেত্রকে কুমিল্লা রণাঙ্গনে আক্রমন চালাবার জন্য ব্যবহার করতে হত, কিন্তু তা আক্রমন চালাবার জন্য পর্যাপ্ত ছিলনা।

পরে দি লিবারেশন ওয়ার এর সহ-গ্রন্থাকার হিসেবে শ্রী কে সুব্রাহ্মনিয়াম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্নাঙ্গ যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে কমপক্ষে নয় মাসের সময় প্রয়োজন বলে নির্ধারন করেন। তিনি বলেন "এ ধরনের সফল আক্রমন পরিচালনার আগে সব ধরনের প্রস্তুতি চালানো, বিশ্বজন মতামত গড়ে তোলা, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিশ্রুতি গ্রহন ইত্যাদির জন্যে আমাদের নয় মাস সময় দরকার"।

সামরিক প্রস্তুতি ছাড়াও চীনা হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কূটনৈতিকভাবে বন্ধ করা এবং অনুকূল বিশ্বমত তৈরী করার জন্যেও ভারতের সময়ের প্রয়োজন ছিল। ভারতকে একই সঙ্গে এইসব ক্ষেত্রে তৎপরতা শুরু করতে হয়। ভারতের বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানরা যখন তাদের সশস্ত্র বাহিনীর পূনর্বিন্যাস ও পুনঃসজ্জার কাজ দ্রুতগতিতে করে যাচ্ছিলেন ঠিক তখন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পর্কিত পুরনো একটা প্রস্তাবকে চাঙ্গা করে তোলেন এবং ১৯৭১ এর ৯ আগস্ট চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের নিজের অনুকূলে বিশ্বমতকে প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যে

পূর্ব পাকিস্তানের অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্যে ভারতে যাওয়া শরণার্থী পরিস্থিতির বিষয়কে কাজে লাগায় এবং গুণান্বিত করে। অন্যদিকে বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে ভারত পাকিস্তান সেনা বাহিনীকে অবাধ সুযোগ নিতে দেয়নি। সে সাধারভাবে 'মুক্তি বাহিনী' নামে পরিচিত বিদ্রোহী বাহিনী গড়ে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানের দলত্যাগী ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের লোকেরা এই বিদ্রোহী বাহিনীর মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই বাহিনী এসে যোগ দেয় ছাত্র, আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবী ও সক্ষম শরনার্থীরা। কর্নেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী এদের সর্বাধিনায়ক হন।

এই বিদ্রোহী বাহিনীর জন্যে রাজনৈতিক ছত্রছায়া যোগাবার উদ্দেশ্যে ২৫শে মার্চ সেনাবাহিনীর তৎপরতার মুখে কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতকে ভারত কাজে লাগায়। এদের মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন তাজউদ্দিন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ। তারা ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় 'বাংলাদেশ'কে মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি প্রবাসী সরকার গঠনের জন্যে সংগঠিত হন।

ভারতের সমরনায়কেরা মুক্তিবাহিনীর জন্যে নিম্নরুপ ব্যবস্থাবিধি গ্রহন করেনঃ

"নিজেদের মাটিতে তাদের মোতায়েন করা, উদ্দেশ্য প্রথমত বঙ্গে সংরক্ষণাত্মক দায়িত্বপালনের জন্যে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীসমূহকে উদ্বিগ্ন করা ও ব্যতিব্যাস্ত রাখা, জাতীয়তাঃ ক্রমাগতভাবে গেরিলা তৎপরতার বিস্তার ঘটিয়ে পূর্ব সেক্টরে পাকিস্তানী বাহিনীসমূহের মনোবলের ক্ষয়সাধন এবং বিশেষতঃ পাকিস্তান আমাদের উপর বৈরিতার সূচনা করলে সে ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলীয় পদাতিক বাহিনীর সহায়ক হিসেবে ক্যাডারদেরকে কাজে লাগানো। (প্রাণ চোপর, ইন্ডিয়ান সেকেন্ড লিবারেশন দিবস, পৃ ১৫৫)

এই দায়িত্বভার পর্যাক্রমে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সেই মতো মুক্তিবাহিনীকে প্রস্তুত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে তাদেরকে অন্তর্ঘাতী কর্ম তৎপরতা, চোরাগুপ্তা হামলা, গ্রেনড নিক্ষেপ ও গুলি চালানোর ব্যাপারে চার সপ্তাহের প্রশিক্ষন দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এই প্রশিক্ষন আট সপ্তাহ পর্যন্ত চলে এবং এতে সব ধরনের ছোট অস্ত্র চালনাসহ আরও কিছু সমরকৌশল শেখানো হয়।

পরিশেষে, এদের মধ্যে ৩০হাজার সদস্যকে ভারতের নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি চিরাচরিত পদ্ধতির লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্ত্র সজ্জিত ও সংগঠিত করা হয় এবং অবশিষ্ট ৭০ হাজার লোক গেরিলাযুদ্ধ চালাবে বলে স্থির করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ তৎপরতাকে তিনটি পর্যায়ে ফেলা যায়ঃ

প্রথম পর্যায়ে (জুন-জুলাই)- তারা সীমান্ত এলাকায় তৎপরতা চালায়, যেখানে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন দানের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে থাকত। এই পর্যায়ে বিদ্রোহীরা খুবই ভীরু আচরন প্রদর্শন করে এবং চিন্হিত হওয়া বা পাল্টা-আক্রমনের সামান্যতম আভাস পেলে তারা নিজেদের আস্তানায় দ্রুত পালিয়ে যেত। এ সময় তাদের প্রধান কয়েকটি সাফল্য ছিল ছোটখাট কালভার্ট উড়িয়ে দেয়া, পরিত্যাক্ত রেলপথ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়া, গ্রেনেড নিক্ষেপ কিংবা কম গুরুত্বপূর্ন কোন রাজনৈতিক নেতাকে লাঞ্চিত করা।

দ্বিতীয় পর্যায় (আগস্ট-সেপ্টেম্বর): তারা নিজেদের প্রশিক্ষন ও তৎপরতা পদ্ধতির ব্যাপারে উন্নতি দেখায়। তাদের মধ্যে আরও আস্থা, প্রেরণা ও নেতৃত্ব গড়ে ওঠে বলে অনুমিত হয়। এ সময় তারা সামরিক কনভয়ের উপর অতর্কিত হামলা চালায়, থানার উপর আঘাত হানে, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ উড়িয়ে দেয়, নৌযান ডুবিয়ে দেয় এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করে। তাদের এ তৎপরতা ঢাকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে (অক্টোবর-নভেম্বর): তারা সীমান্তে ও অভ্যন্তরে মোটামুটি ভালভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট এই বাহিনী সীমান্ত ফাড়িগুলোতে প্রচন্ড হামলা চালায় এবং গুরুত্বপূর্ন নগর ও শহরে গোলযোগ উসকিয়ে দেয়। এই দ্বৈত হামলা আমাদের সম্পদের হানি ঘটায় এবং মনস্তাত্বিক চাপের সৃষ্টি করে।

এদের তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষন শিবিরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এই সংখ্যা ছিল মে মাসে ৩০টি, আগস্ট মাসে ৪০টি, সেপ্টেম্বরে ৮৪টি। প্রত্যেক শিবিরে এক প্রশিক্ষন-চক্রে ৫০০ থেকে ২০০০ বিদ্রোহীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষমতা ছিল। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এদের সংখ্যা মোট ১ লাখে দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম বিদ্রোহীদের জন্যে অস্ত্র ও সরঞ্জাম পাওয়ার ব্যাপারে ভারতের কিছু সমস্যা ছিল, তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পর এতবড় একটা পরাশক্তির কাছ থেকে তার সম্পদ পাবার সুযোগ হয়ে যায়। ভারত বিদ্রোহীদের যেসব অস্ত্র দিয়েছে, তার স্থলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করবে এই মর্মে সোভিয়েত নিশ্চয়তা পাবার পরই কেবল গেরিলাদের কাছে ভারতের অস্ত্র সরবরাহ বদ্ধি পায়। (নিউজ রিভিউ অন পাকিস্তান, নিউ দিল্লি, নভেম্বর ১৯৭১) ঢাকায় একজন বৃটিশ সাংবাদিক আমাকে জানান, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত সেকেলে সোভিয়েত অস্ত্রসহ বিদ্রোহীদের দেখেছেন। এইসব অস্ত্র ইতিপূর্বে ইউরোপে স্তুপিকৃত ছিল। এছাড়া ভারতের সহায়তায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার বিদেশস্থ বাংলাদেশের দূতদের মাধ্যমে সংগৃহীত চাদার টাকা দিয়ে কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র কিনেন।

পাকিস্তান এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে কিভাবে? এই বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান উপদ্রব মোকাবেলার জন্যে তার ছিল ১হাজার ২শ ৬০জন অফিসার ও ৪১হাজার ৬০ অন্যান্য পদের লোক। এই জনশক্তি নিয়ে তাকে ৫৫হাজার ১শ ২৬ বর্গমাইল এলাকা নিয়ন্ত্রন করতে হত।

কিংবদন্তীর গেরিলা নায়ক টি,ই, লরেন্স এই পরিস্থিতির অনুপাত দেখিয়েছেন প্রতি চার বর্গমাইলে ২০জন সৈন্য। তার এই সংখ্যানুপাত দেয়া হয়েছে মরু অঞ্চলের যুদ্ধবিগ্রহের প্রকরণে, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের মত প্রচুর উদ্ভিদরাজির প্রতিবন্ধকতা নেই। সেই মরু-অঞ্চলের সংখ্যানুপাত ধরলেও পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে পাকিস্তানের দরকার ছিল প্রাপ্ত সৈন্য সংখ্যার প্রায় সাতগুণ। বিদেশী সংবাদদাতা ডেভিড লোশকের মতে ২ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য প্রয়োজন, তা সত্বেও পাকিস্তান এই ব্যাপক বিদ্রোহ পূর্ন নয় মাস অর্থ্যাৎ যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখে।

পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ফাড়ি, জেলা ও মহকুমা সদরের দখল রক্ষার মাধ্যমে তার উপস্থিত অব্যাহত রাখে। সে ৩৭০টি সীমান্ত ফাড়ির মধ্যে ৯০টি এবং প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শহর নিজের দখলে রাখে। শহরগুলোয় নিজেদের ঘাটি স্থাপন করে সেনাবাহিনী সংলগ্ন এলাকায়, বিশেষ করে বিদ্রোহীদের তৎপরতা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করত। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে যা ঘটত তা হচ্ছে শায়েস্তাকারী বাহিনী তাদের (মুক্তিবাহিনী) উপর চড়াও হবার আগেই তারা সটকে পড়ত।

অবশ্য বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্রোহীরা প্রায়শঃ এই বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছে এবং সম্পূর্ন নিশ্চিহ্ন হবার আশংকা থাকলে তবেই তারা নিজেদের গুপ্তস্থানে আত্মগোপন করেছে।

আমাদের বাহিনী এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ব্যাপি বেশ তৎপর ছিল। ঐসময় বিদ্রোহেরও ছিল দৈনদশা। তারপর উপদ্রব যত বাড়তে থাকে, আমাদের অধিনায়করা তত উদাসীন হয়ে পড়েন এবং যেক্ষেত্রে তৎপর না হলেই নয়, কেবল সেই ক্ষেত্রে তৎপর হন। শেষ পর্যায়ে (অক্টোবর-নভেম্বর) তারা সাধারনত নিজেদের ঘাটিতে অবস্থান করাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন এবং অধিনায়কত্বের ঝুকি নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এর পেছনে অনেক কারন থাকতে পারে, যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কোনরকম ক্ষয়পূরণের সুযোগ ছাড়া দীর্ঘ অনিমিয়ত যুদ্ধ। বাঙ্গালীরা তাদের আচরনের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের পরিণতির উত্থান-পতন অনুসরন করতে থাকে। তারা স্বভাবতঃ বিজয়ীদলের পক্ষ নেয়। আমাদের সেনাবাহিনী যখন যে এলাকায় থাকত, তারা তখনকার মত আমাদের সঙ্গে থাকত, কিন্তু সেই সেই বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হলে তারাও তখন নিজেদের নতুন প্রভুকদেরকে (মুক্তিবাহিনীকে) স্বাগত জানাত। বুদ্ধিমান লোকেরা নিজেদের কাছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পতাকা রাখত এবং সুযোগমত যখন যেটা দরকার ব্যবহার করত। তবে পতাকা উচ্চ রাখার ব্যাপারটা অত সহজ ছিলনা। অবস্থা না বুঝে ভুল পক্ষ নিলে সে জন্যে তাদেরকে প্রচুর মাশুল দিতে হত। এধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

ঘটনাটি ঘটে আগস্ট মাসে নোয়াখালি জেলায়। ৭ জন সৈন্যসহ একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে বিদ্রোহী অধ্যুষিত একটি এলাকা বিদ্রোহমুক্ত করার জন্যে নিয়োগ করা হয়। নির্দেশ মোতাবেক এই তরুন অফিসার কৌশল ও নমনীয়তা নীতি গ্রহন করেন। তার ৫জন সৈন্য বিদ্রোহীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। এরপর একজন ক্যাপ্টেনের নিয়ন্ত্রণে সেখানে নতুন করে সৈন্য পাঠানো হয়। বিদ্রোহীরাও নতুন শক্তিতে পাল্টা আক্রমন করে একটা দৃষ্টান্তস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যাপ্টেন আগের দলের কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এবং বুঝতে পারেন কঠোরভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা না করলে ভাগ্যের এমন নির্মম পূণারাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। তিনি বিদ্রোহীদের কয়েকদফা জোর হুশিয়ারী দেন। কিন্তু এতে কোন ফল হয়না। এরপর তিনি পুরো এলাকা ঘেরাও করে ফেলেন এবং তার সমস্ত অস্ত্র নিয়ে এলাকাটির উপর চরম আঘাত হানেন। চীৎকার, আর্তনাদ আর ঘন কালো ধোয়ায় আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কিছু সময় পর সাদা পতাকা হাতে একজন বৃদ্ধ লোক যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জানিয়ে উপস্থিত হন। এই অনুরোধ মেনে নেওয়া হয়, এবং এই প্রক্রিয়ায় অনেক জীবনের অবসান ঘটে।

এইভাবে কখনও কখনও বিদ্রোহীরাও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশকারীদেরকে আরও বেশি প্রবলভাবে শাস্তি দিতে সক্ষম হয়।

মূল সমস্যা ছিল নিরীহ সাধারন লোকদের কাছ থেকে বিদ্রোহীদেরকে পৃথক করে রাখা। মাছ যেমন পানিতে মিশে যায়, তারাও সেভাবে সাধারন মানুষের সঙ্গে মিশে যেত। জেনারেল টিক্কা খানকে পরামর্শ দেয়া হয় যে ৩ কিলোমিটার সীমান্ত বেষ্টনী জনশূন্য করা হোক যেন সেনাবাহিনী ঐ এলাকার সন্দেহজনক প্রত্যেককে গুলি করতে পারে। কিন্তু টিক্কা খান এই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন। তার মতে এই ব্যবস্থা শরণার্থীদের পূনর্বাসন সমস্যাকে আরও সংকটজনক করে তুলবে এবং তখন তিনি ৪ সেপ্টেম্বরে সাধারন ক্ষমা ঘোষনার পর ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পূনর্বাসনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

সুতরাং, বিদ্রোহী এবং তাদের আশ্রয়দাতারা বেশ মিলেমিশে অবস্থান করতে থাকে। এদের সবার বাহ্যিক চেহারা একই রকম হওয়ায় একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক করা খুব মুশকিল ছিল। যখন তখন একজন বিদ্রোহী হাতে করে স্টেনগান নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারত, আবার জরুরী অবস্থায় দরকার হলে সেই অস্ত্র ক্ষেতের ভেতর ফেলে দিয়ে একজন নিরীহ চাষীর মত কাজ করে যেতে পারত। অন্যদিকে আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ একজন জেলে নিজের কাজ ফেলে অগ্রসরমান কোন কনভয়ের সামনে মাইন পুতে রেখে সটকে পড়তে পারত। বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে মনে করে এখানে এরকম একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করছি।

রাজশাহীতে থেকে খবর পাওয়া গেল যে বিদ্রোহীরা রোহনপুর এলাকায় প্রবেশ করে জন-সাধারনের উপর খাদ্য, অর্থ ও আশ্রয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে। একদল সৈন্য ঐ এলাকায় অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তিনজন লোককে কর্মরত অবস্থায় দেখা ছাড়া আর কিছুই পেলনা। এই অবস্থায় তারা ফিরে আসছিল, এমন সময় একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখতে পেয়ে তারা সঙ্গীনের মুখে বিদ্রোহীদের অবস্থান জানার জন্যে চাপ দেয়। তারই ইঙ্গিতে সেনারা ঐ তিনজন কৃষককে পাকড়াও করে ক্ষেত থেকে বেশ কয়েকটি গ্রেনেড, যথেষ্ট পরিমানে বিষ্ফোরক ও প্রচারপত্র উদ্ধার করে। এরা তিনজনই মুক্তিবাহিনীর খাটি সদস্য বলে প্রমানিত।

এরা সেনাবাহিনীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে আরও বিভিন্ন রকম রকম কৌশল অবলম্বন করত। উদাহরণস্বরুপ, জুলাই মাসে বেনাপোল ও রঘুনাথের মধ্যবর্তী স্থলে (যশোর সেক্টরে) দুজন সৈন্য তাদের নিয়মিত টহলের সময় দেখতে পায় যে একজন অসহায় চেহারার লোক ঝোলা ভর্তি শাকসব্জি নিয়ে যাচ্ছে। তারা কোন বিদ্রোহী দেখতে না পাওয়ায় তাদের সময়ের সদ্বব্যবহার হলনা এবং তাই তারা লোকটিকে দেখে লক্ষ্যহীনভাবে বলতে লাগল 'ঝোলায় করে কি নিয়ে যাচ্ছ বাবা?' বৃদ্ধ লোকটি ভয়ে কাপতে লাগল। তারা যখন লোকটির ঝোলা খুলল, দেখা গেল তাতে রয়েছে শাক-সব্জি দিয়ে ঢাকা প্রচুর টাইম-ফিউজ (অন্তর্ঘাতী তৎপরতার জন্যে)।

অনুরুপভাবে লেফটেন্যান্ট ফররাখ ব্রহ্মপূত্রের চর এলাকায় অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। তখন মৌসুমী ফলভর্তি একটি নৌকা তিনি আটক করেন। নৌকার খোল ভর্তি ছিল মাইন ও গ্রেনেড।

বিদ্রোহীরা চিহ্নিত হবার হাত থেকে বাচবার জন্যে বিভিন্ন উপায় জন্যে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করত। আমরা যখন প্রধান পথে যাতায়াত করতাম, তখন তারা সাধারনত গ্রামের পথ ধরে চলাচল করত। রংপুরের একজন বিদ্রোহী সীমান্তের ওপারে তার এক সশস্ত্র কমরেডের কাছে এক পত্রে লিখলঃ 'পাকিস্তানী সেনারা কখনই আমাদের সনাক্ত করতে পারবেনা কারন, তারা প্রধান প্রধান সড়ক, সর্বাধিক ব্যবহৃত ফেরী এবং প্রধান প্রধান ঘাট পাহারা দেয়। অন্যদিকে আমরা অলিগলি, পার্শ্বপথ এবং অব্যবহৃত রাস্তাঘাটই ব্যবহার করি। এছাড়া তারা নৌকার খোলের মধ্যে কি আছে তা লক্ষ না করে নৌকার উপর ভাগই কেবল তল্লাশী করে। আমাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে মসজিদের ইমাম কিংবা শান্তি কমিটির বিশিষ্ট কোন সদস্যের বাড়ি, স্বভাবতঃ সেনাবাহিনী যাদের অনুগত বলে সন্দেহ করছেনা। আমাদের উপায়গুলো সূক্ষ্ম। আমাদের উদ্দেশ্য উচ্চ। আমরা জিতবই'।

আরও সময় পেরিয়ে যাবার পর, অন্তর্ঘাতি কাজে তারা বেশকিছু আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে। যেমন শুরুতে তারা বুবিট্র্যাপ ও নিরাপত্তা ভাল্ব ব্যবহার করত, কিন্তু যখন আমরা একটি শূন্য গাড়ি বা মূল গাড়ির অগ্রভাগে রেলবগী জুড়ে দেওয়ার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা নষ্ট করার পদ্ধতি শিখে ফেলি, তখন তারা দূর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক বিষ্ফোরক ব্যাবহারের কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে তারা চলন্ত লক্ষ্যবস্তু ইচ্ছেমত উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। যখন তাদের ডাইনামো চিহ্নিত হয়ে পড়ে, তখন তারা ড্রাই ব্যাটারী সেল ব্যবহার করতে শুরু করে, যা সাধারণ টর্চে বা বাশের চোঙ্গায় করে অনায়াসে চালান করে দেয়া যায়।

নদীর মোহনায় পরিচালিত অভিযানের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটত। তারা জাহাজ, বার্জ বা কোষ্টারের সঙ্গে নিরেট ধরনের কোন বিষ্ফোরক বেধে দিত। কিন্তু আগস্ট নাগাদ তারা চুম্বক মাইনের ব্যপক ব্যবহার শুরু করে দেয়। এই মাইনের মুখ (চুম্বকের) হওয়ার লক্ষ্য বস্তুর যে কোন অংশে একে সহজেই সেটে দেওয়া যায়।

কিন্তু এক পর্যায়ে এই মাইন তাদের নিজেদের জন্যএ বিপদজনক হয়ে উঠলে তারা এমন সব ডুবুরী নিয়োগ করতে আরম্ভ করে দেয়, যারা লুকিয়ে ডুবে ডুবে জাহাজের কাছ পর্যন্ত গিয়ে তাতে মাইন গেথে দিয়ে আসতে পারত। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নৌবাহিনী ৩০০ ফ্রগম্যান ফ্রগম্যানকে প্রশিক্ষন দেয়। কখনও কখনও ডুব সাতারুর শ্বাস-প্রশ্বাএর জন্যে তারা নল ব্যবহার করত। পরে তারা বাশের টুকরো বা কলাগাছ ভাসিয়ে তার উপর সম্পূরক মাইন বহন করে লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিয়ে যেত এবং ইস্পাতের সেই লক্ষ্যবস্তুর গায়ে সহজেই তা সেটে যেত।

তাদের অন্তর্ঘাতের তালকা অনুযায়ী ২৩১টি সেতু, ১২২টি রেললাইন এবং ৯০টি বিদ্যুত কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। অতি উচ্চমাত্রার সচেতনতা ছাড়া এত বিপুল পরিমাণে ক্ষতি সাধন তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এখন তাদের তেজস্বিতার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

একটি বাঙ্গালি বালককে অন্তর্ঘাতি প্রচেষ্টা চালাবার অপরাধে ১৯৭১ এর জুন মাসে রাজশাহী জেলার রোহমপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে কোম্পানী সদর দফতর নিয়ে যাওয়া

হয়, কিন্তু সে কোন তথ্য প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সব চেষ্টা ব্যার্থ হলে মেজর 'আর' তার বুকের দিকে স্টেনগান তাক করে বলেন, 'এই তোমার শেষ সুযোগ। স্বীকার না করলে বুলেট দিয়ে তোমার শরীর এফোড় ওফোড় করে দেওয়া হবে।' এই কথায় সে নতজানু হয়ে বসল, মাটিতে মাথা ঠেকাল, তারপর উঠে দাড়িয়ে বসল, 'আমি এখন মরতে চাই। আমার দেশের পবিত্র মাটির ছোয়া পেয়ে আমর রক্ত ধন্য হোক। তবেই তো আমার দেশ তাড়াতাড়ি স্বাধীন হবে।'

আধুনিক কৌশলে সমৃদ্ধ ও উচ্চ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এরকম বিদ্রোহীদের সম্পূর্ন মুছে ফেলা সেনাবাহিনীর জন্যে সহজ কাজ ছিলনা, যদিও আপ্রান চেষ্টা করছিল। প্রথম প্রথম সেনাবাহিনী সড়কপথে সৈন্য পাঠাত, কিন্তু কয়েকদফা বিষ্ফোরনের পর তাদেরকে গ্রামাঞ্চলে তৎপরতা চালাতে হয়। এরফলে তাদেরকে চোরাগুপ্তা আক্রমনের শিকার হতে হয়। বর্ষাকালে তারা বিদ্রোহীদের খুজে বের করার জন্যে দেশী নৌকা ব্যবহার করত কিন্তু জলপথে চলাচলের প্রশিক্ষণ দেওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে পারঙ্গমতা দেখাতে তারা ব্যার্থ হয়। কখনও কখনও হয় তাদের নিজেদের ভুলে নিজেরাই নৌকা ডুবিয়ে বসে, না হয় বিদ্রোহীদের তৎপরতার জন্যে নৌকাডুবি ঘটে। এরপর আমরা কাদার মধ্যদিয়ে পায়ে হেটে অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু আগাছা আর জোকের জন্যে আমাদের পক্ষে এই অভিযান আরও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। সমতল ভূমির লোকদের হয়রানির জন্যে জোকই যথেষ্ট। আমি শহীদ নামে একজন লেফটেন্যান্টকে দেখেছি যার পায়ে জোকের অসংখ্য কামড় ছিল। যুদ্ধের পরও দীর্ঘদিন তার ক্ষত শুকোয়নি।

খুবই লজ্জার সঙ্গে বলতে হয়, এইসব অভিযানকালে কিছু সৈন্য লুটতরাজ, হত্যা, ও ধর্ষনের মত খারাপ কাজ করেছে। সরকারীভাবে ৯টি ধর্ষনের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে এবং দোষীদের গুরুতর শাস্তির দেওয়া হয়। কিন্তু শাস্তি দিলেও এতে যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েছেই। সব মিলিয়ে এইধরনের কয়টা ঘটেছে জানিনা, তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একজন সৈন্যও যদি নারী ধর্ষন করে থাকে তবে তা পুরো সেনাবাহিনীর সততার উপর কালিমা লেপনের জন্যে যথেষ্ট। এই ধরনের বর্নর ঘটনা স্বাভাবিকভাবে বাঙ্গালীদেরকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে। তারা আগেই আমাদের খুব একটা পছন্দ করত না, এরপর তারা আমাদের আরও প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করতে থাকে। এই প্রবনতাকে আয়ত্বে আনতে আনবার বা এই ঘৃণার ছাপ মুছে ফেলবার জন্যে গুরুত্বসহকারে কোন প্রচেষ্টাও চালানো হয়নি। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের কাছ থেকে ব্যপক সহযোগীতার প্রশ্নই ওঠেনা। যারা ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তারাই কেবল ঝুকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এসব দেশ প্রেমিক নাগরিক দুই দলে সংগঠিত হন। প্রবীন ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা শান্তি কমিটি গঠন করেন এবং যুবক ও সক্ষম ব্যক্তিদেরকে রাজাকার হিসেবে বাছাই করা হয়। কমিটিসমূহ ঢাকা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন পল্লী এলাকায় গঠন করা হয় এবং তারা স্থানীয় জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে উপযোগী যোগসূত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। একইসঙ্গে তারা বিদ্রোহীদের কোপানলে পড়ে এবং এদের মধ্যে ২৫০ জন হতাহত বা গুম হয়ে যায়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং তাদের মধ্যে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বোধ জাগ্রত করা হয়। রাজাকারদের সংখ্যা ৫০ হাজারে উন্নীত করা হয়-লক্ষ্য ছিল একলাখের।

সেপ্টেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল জেনারেল নিয়াজীর কাছে অভিযোগ করেন যে, তিনি জামাতে ইসলাম মনোনীত একটি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। জেনারেল আমাকে তার কার্যালয়ে ডেকে বললেন, "এখন থেকে তুমি রাজাকার 'আল-বদর' ও 'আল-শামস' নামে পরিচিত করবে। এতে কারো ধারনা হবে না যে এরা একই দলের সদস্য।" আমি তার আদেশ মান্য করলাম।

আল-বদর ও আল-শামস উৎসর্গিত স্পৃহা ছিল এবং তারা সাগ্রহে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছে। তারা যেমন কঠোর পরিশ্রম করেছে তেমনি যথেষ্ট দূর্ভোগও পুইয়েছে। দালালীর অভিযোগে তাদের বা তাদের উপর নির্ভরশীল লোকদের মধ্যে ৫ হাজার জন মুক্তিবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন আত্মত্যাগের এমন মহান নজির স্থাপন করেন, যা বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে তুল্য। উদাহরণস্বরুপ, নওয়াবগঞ্জ থানায় গালিমপুরের একজন রাজাকার বিদ্রোহীদের একটি গোপন অবস্থানের খোজ করার জন্যে সৈন্যদের সঙ্গে পথ প্রদর্শক হিসেবে যায়। সে ঘরে ফিরে এসে দেখে তার তিনটি পূত্রকে হত্যা এবং একটি মেয়েকে অপহরন করা হয়েছে। এই ক্ষতি সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের জন্যেই তাকে মেনে নিতে হয়। আর একজন রাজাকার গোমস্তাপুরে একটি সড়ক-সেতু পাহাড়া দেবার সময় বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে। বিদ্রোহীরা তাকে 'জয় বাংলা' বলাবার জন্যে বলপ্রয়োগ করে, কিন্তু অবিরামভাবে সে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্গীনের খোচায় তাকে প্রাণ দিতে হয়।

অবশ্য প্রশিক্ষন ও অস্ত্রের ব্যাপারে রাজাকাররা মুক্তিবাহিনীর সমকক্ষ ছিলনা। তাদের প্রশিক্ষন ছিল দুসপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহের। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীকে ৮ সপ্তাহের নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজাকারদের অস্ত্র ছিল সেকেলে ধরনের ৩০৩ রাইফেল, অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর ছিল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসহ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। তাই সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজাকাররা ছিল একটি সম্পদ মাত্র, কিন্তু স্বাধীন কোন দায়িত্ব দিয়ে তাদের উপর নির্ভর করা যায়নি। সুতরাং বিদ্রোহের আসল ধাক্কাটি খেতে হয়েছে নিয়মিত বাহিনীকে এবং তারা নির্ভীকচিত্তে সব দুর্ভোগ মাথা পেতে নিয়েছে। তাদের দূর্ভোগের মাত্রা কেবল হতাহতের সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায়না। গভীরতর আঘাত এসেছিল মনস্তাত্বিক ক্ষেত্রে। সেনাবাহিনীর মনোবল যে জিনিশের কারনে সবচেয়ে বেশী ভেঙ্গে যায় তা হচ্ছে চিকিৎসার জন্যে আহতদের সব সময় সামরিক হাসপাতালে নেওয়া বা আহতদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো সম্ভব হয়নি। আহতরা অনেক সময় হেলিকপ্টারের জন্যে সীমান্ত ফাড়িতে দিনের পর দিনের পর অপেক্ষা করেছে। কারন সড়কপথে সাধারনতঃ মাইন পোতা থাকত এবং আচমকা গুলি খাওয়ার ভয় থাকত। অন্যদিকে হেলিকপ্টারই বা আসবে কিভাবে। 'আঘাত খুবই মারাত্মক এবং আহতকে আকাশ পথে নিয়ে আসা দরকার' এই মর্মে রেজিমেন্টাল মেডিক্যাল অফিসার (আর-এম-ও) সার্টিফিকেট না দেওয়া পর্যন্ত হেলিকপ্টার পাঠাবার বিধান ছিল না। তাছাড়া কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত

ব্যাটেলিয়ন সদর থেকে তিনি আহতের কাছে যেতেও পারেননা। আহতকে যদি অতর্কিত হামলা বা মাইনের কারণে সরানো সম্ভব না হয়, তাহলে একই কারণে চিকিৎসকই বা কেমন করে সড়কপথে ঐ এলাকায় যাবেন?

অবশ্য আহতদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবান ঢাকায় সমন্বিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসিত হবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু সে দৃশ্য চোখে দেখার মত নয়। কারও বা কয়েকটি প্রত্যঙ্গ কর্তিত, কারও মুখ পুড়ে ঝলসে গেছে, কেউ কেউ চিরতরে অন্ধ বা বধির হয়ে গেছে। এদের অধিকাংশ এমনকি আরোগ্য লাভের পরও পঙ্গু জীবন যাপন করতে বাধ্য হবে। অনেকে ছোটখাট আঘাত, বিক্ষত পা, ছত্রাক ও জোকের কামড়ের ক্ষত নিয়েই মাঠে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছে। বহুমাস ধরে তারা বিশ্রাম, অবসর বা বিনোদন কাকে বলে জানেনা। আর যারা মৃত্যুবরণ করেছেন প্রথম প্রথম তাদের লাশ আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাতাম। কিন্তু জুলাই-আগস্টের দিকে যখন এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, অনাবশ্যক ভীতি সঞ্চারিত হবে এই আশঙ্কায় আমরা তখন তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে লাশ পাঠানো বন্ধ করে দেই। এই অপ্রিয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সফররত জেনারেল স্টাফ প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষন করে হলে তিনি নাকি অবজ্ঞার সঙ্গে মন্তব্য করেন, 'যে মরে গেছে তার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানই কী আর পূর্ব পাকিস্তানই কী- দুই জায়গায়ই অপ্রয়োজনীয়'।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে নিহতদের আত্মীয়রা সব সময়ই চেয়েছেন লাশ যেন তাদের কাছে পাঠানো হয়। ৩১ ফ্রন্টিয়ায় ফোর্সের কম্যান্ডিং অফিসারের কাছে পাঠানো একজন অফিসারের বোনের একটি চিঠির কথা মনে পড়ছে। তিনি চিঠিতে এক পর্যায়ে লিখেছেন, 'আমি আমার সুদর্শন ভাইকে করাচী ছাড়ার সময় আপনাদের হাওয়াল করেছিলাম। যদি আপনারা ঠিক সেইভাবে আবার ফিরিয়ে আনতে না পারেন তাহলে অন্তত তার লাশ নিয়ে আসতে যেন ভুল করবেন না।' কিন্তু তার ভাইকে জীবিত দূরে থাক মৃত অবস্থায়ও তিনি দেখতে পারেননি কোন দিনও।

বিপর্যয়ের মুখোমুখি

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি কি অভ্যন্তরীন কি আন্তর্জাতিক-কোনখানের রাজনীতি দিয়েই প্রভাবিত করা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে খারাপ হতে থাকে। যেন নিয়তির টানে সে আপনাআপনি ধাবিত হচ্ছে। ডাঃ মালিকের অসামরিক মন্ত্রিসভার কায়েম কিংবা দেশের বাইরে পাকিস্তানের কাকুতি-মিনতি কোন কিছু দিয়েই পরিস্থিতির মধ্যে ইতরবিশেষ ঘটানো যায়নি।

খোদ ঢাকার জীবনও বেশ সংকটজনক হয়ে ওঠে। এমন কোনদিন যায়নি যেদিন লুটতরাজ, অগ্নিকান্ড রাজনৈতিক হত্যাকান্ড বা বোমা বিষ্ফোরন ঘটেনি। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি। সাবেক গভর্নর আবদুল মোনেম খান ২৩ অক্টোবর প্রকাশ্য দিবালোকে তার বাসভবনে গুলিতে নিহত হন। এর মাত্র কয়েকদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর গাড়ি বোমা বিষ্ফোরনে উড়ে যায়। এতে ৫ জন নিহত এবং ১৩ আহত হয়। পরেরদিন বিপুল আয়তন স্টেট ব্যাংক ভবনে একটি বোমা বিষ্ফোরিত হয়। এরপর গভর্নর হাউসের পাশেই ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ভবনে আগুন ধরে। টেলিভিশন স্টেশন এই ভবনে অবস্থিত ছিল।

এই ধরনের বহু ঘটনা নৈমিত্তিক হয়ে দাড়াবার ফলে জনসাধারন ক্রমেই এতে যেন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। একারণে বিদ্রোহীরা দেশ-বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষ ধরণের কিছু একটা করার প্রয়োজন বোধ করে। এই লক্ষ্যে তারা হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের টয়লেট সেকশন উড়িয়ে দেয়। এই ভবনের একটা বিরাট অংশ ধ্বংশ হয় যা মেরামত করতে বেশ কয়েকট সপ্তাহ সময় লেগে যায়।

১১ অক্টোবর বিদ্রোহীরা তৎপরতার সঙ্গে নতুন এক ধরনের কৌশল যুক্ত করে। তারা ঢাকায় এই প্রথমবারের মত মর্টার ব্যবহার করে। আমি নিজেই বিমানবন্দর সংলগ্ন পি-আই-এ এর রন্ধনশালার কাছে ভোর রাত ১টা ৪০ মিনিটে প্রচন্ড শব্দ শুনতে পাই। তাক না করে দুটি গোলা বিমানবন্দরের দিকে ছোড়া হয় এবং তা লক্ষভ্রষ্টভাবে বিষ্ফোরিত হয়। তা সত্বেও ঘটনাটা স্থানীয় প্রশাসনকে বিচলিত করে। কারন আশংকা করা হচ্ছিল যে, পরেরবার গোলাবর্ষন ক্রুটিপূর্ণ নাও হতে পারে।

ঢাকার বিভিন্ন শহরতলীতে বিদ্রোহীরা আধিপত্য বিস্তার করে বলে অনুমান করা হয়। বস্তুতঃ শহরের বাইরের এলাকা তাদের জন্যে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল। কারন আমরা সাধারনত আমাদের তল্লাশ অভিযান নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতাম। এ প্রসঙ্গে সিদ্ধিরগঞ্জের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহীরা সেখানকার প্রধান বিদ্যুতকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী তার কেটে দেয়। কোন বাঙ্গালী কর্মী এই কেন্দ্রের মেরামতে সম্মত হয়নি। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানের সহকারী প্রকৌশলী, একজন লাইন তত্বাবধায়ক, একজন সহকারী ফোরম্যান এবং একজন লাইনম্যান সমন্বয়ে গঠিত পানি ও বিদ্যুত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একটি দলকে এই কাজে পাঠানো হয়। তারা যখন সেখানে কাজ করছিলেন, বিদ্রোহীরা তখন ৩০শে

অক্টোবরের প্রকাশ্যে দিবালোকে তাদের উপর আক্রমন চালায় এতে দলের পাচজনের সবাই নিহত হন। বিদ্রোহীরা যুদ্ধ শেষের এনাম হিসেবে সহকারী ফোরম্যান বদর-ই-ইসলামের লাশ নিয়ে যায়। চারজনের লাশ উদ্ধার করা হয় এবং ৩১ অক্টোবর বিকেল চারটায় পাকিস্তানে পাঠানো হয়।

ঢাকা কিংবা এর যেকোন শহরতলী থেকে দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতকালে মনের মধ্যে স্বাভাবিক অনুভূতি জাগে যে, আমরা শত্রু এলাকার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করছি। ব্যাক্তিগত রক্ষীবাহিনী ছাড়া চলাচল করা ছিল অসম্ভব। অথচ, এইভাবে রক্ষীপরিবেষ্টিত যাওয়া মানেই বিদ্রোহীরা দৃষ্টি আকর্ষন করা এবং তাদের মধ্যে লোভ জাগিয়ে তোলা। তারা দলের উপর অতর্কিত হামলা চালাত অথবা চলার পথে মাইন পুতে রাখত। কেউ কখনও নিরাপদভাবে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পারলেই বিরাট একটা বাস্তব সাফল্য বলে মনে করা হত।

মফস্বল এলাকায় স্থানীয় অধিনায়কের কখনও কোন শান্তিতে ছিলনা। ছিলনা সন্ত্রস্ত অবস্থা থেকে হাপ ফেলবার একটুখানি অবকাশ। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাদেরকে অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে হত। তাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিলঃ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করা, কল-কারখানায় কাজ চালু রাখা, এবং সন্দেহজনক এলাকাকে বিদ্রোহীমুক্ত করা। এইসব এলাকায় একটা করে প্লাটুন বা কোম্পানীর চেয়ে বেশী সৈন্য মোতায়েন করা হতনা। অথচ তাদের দায়িত্ব-এলাকা ছিলো এতবেশী বড় যে, ঐ স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করে দিতে হত। এইসব ভাগ যত ক্ষুদ্র হত বিদ্রোহীদের কাছ থেকে বিপদের আশংকা তত তীব্র হত। এই সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কিছু রাজাকার, ইস্ট-পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সের কিছু লোক, কিছু ওয়েস্ট পাকিস্তান রেঞ্জের যা পুলিশ বাহিনীদের সঙ্গে নিয়োগ করা হত। এই জগাখিচুড়ি সংমিশ্রন লড়াকু সৈন্যদেরকে পঙ্গু করে তোলে। তবে সংখ্যাধিক্য সব সময় নৈতিক শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক। এজন্যে ১০ জনের জায়গায় যখন ৩০ জনকে নিয়োগ করা হয়, তখন সেটা অনেকখানি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বলে ধারনা জন্মায়।

প্রকৃত অর্থে কোন অবস্থানই পুরোপুরি নিরাপদ বা সুরক্ষিত ছিলনা। এরমধ্যে বিশেষ করে যেসব অবস্থানে আধা-সামরিক বাহিনীর লোকেরা থাকে, সেগুলো হচ্ছে বিদ্রোহীদের বিশেষ লোভনীয় লক্ষ্যকেন্দ্র। বিদ্রোহীরা প্রায়ই এদের উপর হামলা চালায় এবং এদেরকে নির্মুল করে দেয়। এর ফলে ব্যাপক আতংকের সৃষ্টি হয় এবং এদের মধ্যে যারা বেশি ভীরু ও অনুগত তারা বিদ্রোহীদের কোন হামলার মোকাবেলা ছাড়াই নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। উদাহরণস্বরুপ নওয়াবগঞ্জ থানায় ৩১ জন রাজাকারের মধ্যে ৩২ জন ২৯ অক্টোবর নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করে। অবশিষ্ট ৭ জনকে পরের দিন বিদ্রোহীরা কাবু করে ফেলে এবং থানাটা শত্রুকবলিত হয়ে পড়ে। এই ধরনের আরও একটা ঘটনা। লোহগঞ্জ থানায় আমাদের ৫৭জন বাঙ্গালী ছিল, যাদেরকে সাধারন ক্ষমার অধীন আন্তসার্ভিস বাছাই কমিটি ক্ষমা করে দেয়। তাদের সঙ্গে ঐ থানায় পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ ও রেঞ্জারের ৩০ জন রাইফেলধারী মোতায়েন করা হয়। ২৮ অক্টোবর এই

৫৭ জন বাঙ্গালীর সবাই পালিয়ে যায়। পরের রাতে আরও লোকজন নিয়ে এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তারা ফিরে আসে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ঐ ৩০ জনের সবাইকে হত্যা করে। এইভাবে এই থানাও বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বিশেষ করে নোয়াখালি, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলার আরও কয়েকটি থানার ভাগ্যেও একই পরিনতি ঘটে।

সীমান্তের দিকে যে কেউ এগুলে যখন তখন শুনতে পাবে ভারতীয়র গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাগুলির শব্দ। তারা সীমান্ত ফাড়ি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় অব্যাহত গোলা বর্ষণ করে চলেছে। জুনের শেষের দিকে তারা এই তৎপরতা শুরু করে এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের এই তৎপরতাও তীব্রতা লাভ করে। আমাদের ভূখন্ডের অভ্যন্তরে প্রতিদিন ৫০০ থেকে ২০০০ রাউন্ড করে গোলা বর্ষিত হয়। এই গোলাবর্ষনের বিবিধ উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ এ হচ্ছে শত্রুতার 'নিয়ন্ত্রিত বিস্তার' সম্পর্কিত ভারতীয় নীতির অংশ। ভারত চায় সীমান্ত এলাকাকে সবসময় উত্তপ্ত রাখতে।

দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা সীমান্ত এলাকায় তৎপর বিদ্রোহীদের চাঙ্গা রাখা,

তৃতীয়তঃ এর মাধ্যমে রণকৌশলগত লক্ষ্য অর্জিত হয়। এতে করে বিদ্রোহী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদেরকে কোন কোন অরক্ষিত অঞ্চল ও ছিটমহল দখল করতে সাহায্য করা হয়। দখলদারদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে আমরা আবার নিশ্চিত গোলন্দাজ হামলার বার চোরাগুপ্তা আক্রমনের সম্মুখীন হই এবং এতে আমাদের প্রচুর হতাহত হয়। এইভাবে একের পর এক তারা আমাদের অনেক ছোট ছোট অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এই অবস্থা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ১২ অক্টোবর বেতার ভাষণে জাতিকে জানান, 'আপনাদের বীর সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানের পবিত্র ভূমির প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষা ও হেফাজতের জন্যে সম্পূর্ন প্রস্তুত।' অথচ এই সময়ে সীমান্ত এলাকার তিন হাজার বর্গমাইল অঞ্চল ভারতের নিয়ন্ত্রনে চলে গেছে।

জেনারেল নিয়াজি অতিরঞ্জিত বিজয়ের দাবী সহকারে প্রেসিডেন্টের এই ঘোষনাকে সমর্থন করে যাওয়াই কর্তব্য বলে মনে করেন। তিনি কয়েকবার ঘোষনা করেন যে, যুদ্ধ যদি বেধেই যায় তাহলে আমরা ভারতের ভূখন্ডে গিয়ে লড়ব। গালভরা বড়াই জাহির করে কখনও তিনি কলকাতা দখল করে বসেন এবং কখনওবা আসাম তার করায়ত্ত হয়ে যায়।

আমি তার জনসংযোগ কর্মীর দায়িত্ব পালনকালে একবার তাকে বললাম, এত বেশি অসম্ভব আশার বাণী শোনাবেন না। উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো না যে ঠকবাজী আর কূটকৌশলই হচ্ছে লড়াই জেতার শ্রেষ্ঠ শয়তানী বুদ্ধি?' অর্থ্যাৎ তিনি শত্রুর সঙ্গে ঠকবাজী করছেন না, করছেন নিজের সঙ্গে।

১৯৭১ এর ২৪ অক্টোবর তার সঙ্গে তার কার্যালয়ে আমার একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণের ঘটনার কথা এই উপলক্ষে আমার মনে পড়ছে।

তিনি বললেন, 'তোমার বন্ধুরা (বিদেশী সাংবাদিকরা) কী বলছে?'

জানালাম, তারা বলছে যুদ্ধ এখন দোড়গোড়ায় এসে গেছে।

'বেশ তো, আমিও প্রস্তুত। আমার প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আমার ৭০ হাজার সশস্ত্র জোয়ান রয়েছে। স্থলভাগে আমি খুবই শক্তিশালী'।

'কিন্তু আপনার কোন বিমান বা নৌশক্তি নেই বললেই চলে'।

'বিমান ও নৌবাহিনী ছাড়াই আমি লড়ব বলে ঠিক করেছি।'

'তবু বিদ্রোহী ও বাইরের আগ্রাসীদের সঙ্গে লড়বার মত যথেষ্ট শক্তি আপনার নেই বলেই আমার মনে হচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে...।'

'তোমার কিসের ভয়?'

'গোটা সীমান্ত জুড়ে আমরা অবস্থান করছি। কিন্তু শত্রুর অবস্থান ঘরে, বাইরে সর্বত্র। আমরা যেন স্যান্ডউইচ। শত্রুদেরকে তো কিছুই করতে হবেনা, কেবল তাদের সুবিধামত কোন দিক দিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করে কেবল ঢুকে পড়তে পারলেই হল। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে জুড়ে যাবে। আমাদেরকে শেষ করার জন্যে এটুকুই তো যথেষ্ট।'

'তোমার আশংকা একেবারেই ভিত্তিহীন। তুমি সম্ভবত সংখ্যা দিয়ে সবকিছুর বিচার করছ। যুদ্ধে জিতবার জন্যে সংখ্যা বড় ব্যাপার নয়, বড় কথা হচ্ছে অধিনায়কত্ব। তুমি তো জানো না, অধিনায়কত্ব কাকে বলে। অধিনায়কত্ব হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সঠিক সংখ্যায় সৈন্য মোতায়েন করা।'

ঠকবাজীর রাজত্বে কেবল যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তার সমর অধিনায়ক নিয়াজী বাস করছিলেন তা নয়। অধঃস্তনরাও সেই একি পীড়ায় ভুগছিলেন।

আমি সবসময় জেনারেল নিয়াজির ডিভিশনাল ও বিগ্রেড সদরে তার সফর সঙ্গী হয়েছি এবং সামরিক শলা-পরামর্শের প্রায় প্রত্যেকটিতে আমি যোগ দিয়েছি। একজন মেজর জেনারেল এবং একজন বিগ্রেডিয়ার ছাড়া প্রত্যেক ডিভিশনাল এবং বিগ্রেড কম্যান্ডার বার বার এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, অত্যন্ত সীমিত সম্পদ এবং প্রচন্ড প্রতিকূলে অবস্থা সত্ত্বেও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তারা সম্পূর্ন পালন করতে সক্ষম হবেন। যেমনঃ 'স্যার, আমার সেক্টরের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবেননা। আমরা সময় এলেই শত্রুকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব।' সব শলা-পরামর্শেরই এই হল মোদ্দা কথা। ভিন্নতর কোন মন্তব্য এলেই আস্থাহীনতা আর পেশাদারী অযোগ্যতার দায়ে ধরা পড়বার ভয়। কেউ চায় না নিজের ভবিষ্যৎ পদোন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলতে।

অধিনায়কদের এই রকমের খাম-খেয়ালী অতি আশাবাদ একদিকে, অন্যদিকে সৈনিকদের প্রশিক্ষন, সাজ-সরঞ্জাম আর মনোবলের মান তেমনি নিম্নস্তরের। দীর্ঘ আট মাস তারা অবস্থার উন্নতির কোন লক্ষন দেখেনি। চিরাচরিত যুদ্ধে লড়বার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন নেওয়ার সময় তারা পায় না। বহু মাস ধরে বিশ্রাম বা অবকাশ কাকে বলে তা তারা জানেনা। অনেকেরই বুট মোজা পর্যন্ত নেই । সবচেয়ে দুঃসহ তাদের অনেকেরই নেই লড়বার মতো অন্তঃস্করণ। কারণ তারা মনে করে যে বাঙ্গালীরা হিন্দুদের সাথে যুক্ত হয়ে মুসলিম জাতিভাইদের বধ করাকে পূণ্যের কাজ মনে করে, সেই বাঙ্গালীদের জন্যে জীবন দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

যুদ্ধশাস্ত্র বলে, তোমার সৈনিকের মনের মধ্যে কোন চিন্তা আলোড়ন তুলছে সেইটা জানতে পারবার মধ্যে নিহিত আছে তোমার অধিনায়কত্বের বারোআনা সাফল্য। তবু আমাদের অধিনায়করা এই গুরুত্বপূর্ন মনস্তত্বটা সাধারণভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। তারা গুনে গেছেন কেবল মাথা আর রাইফেলের কুদোর সংখ্যা। যখন তাদেরকে জানানো হল যে, বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে আমরা ২৩৭ জন অফিসার, ১৩৬ জন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার এবং অন্যান্য র‍্যাংকের ৩৫৫৯ জনকে হারিয়েছি তখন তারা হিসাব করতে বসে গেলেন আর কতজন বেচে থাকল। তাদের মনে একটিবারের জন্যেও এই উপলব্ধি জাগল না যে মাথা-গুনতি হতাহতের ক্ষতির চাইতে মনস্তাত্বিক ক্ষতির মাত্রা ইতিমধ্যেই অনেক বেশী হয়ে গেছে।

এহেন অধোগামী মনোবলের ফলাফলস্বরুপ সৈনিকরা টহলদারী, উচ্ছাস এবং লড়াকু দৃঢ়তা হারিয়ে বসে। পরিনতিস্বরুপ সীমান্তে এলাকায় প্রহরা ঢিলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে সপ্তাহে একবার কি দুবার সৈন্যদের একটি দল নিজেদের দায়িত্ব এলাকা যাচাইপ্রাপ্ত করতে যায় এবং রাতে ঘুমোবার জন্যে ঘাটিতে ফিরে আসে। ১২ নভেম্বর এমনি একটি দল ধর্মদেহ এলাকায় (যশোর সেক্টরের সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে) যায় নিয়মিত টহল দেয়ার জন্যে। তারা দেখতে পায়, ঐ এলাকা ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর ১ নাগা ব্যাটেলিয়নের একটি প্লাটুনের দখলে রয়েছে। অনুপ্রবেশকারীরা ৫ নভেম্বর চুপিসারে সীমান্ত পার হয়েছে এবং এক সপ্তাহ ধরে নির্বিঘ্নে সেখানে অবস্থান করছে। ১৩ নভেম্বর তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়। তাদের চারজন ধরা পড়ে এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের হাতে বন্দী থাকে।

কুমিল্লার দক্ষিণে বেলুনিয়া এলাকায় ঠিক একইরকমের একটি বিষ্ময় লক্ষ্যগোচর হয়। সেখানে দেখতে পাই যে ১০ নভেম্বর নাগাদ বিদ্রোহী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা এই অঞ্চলের অর্ধেক গ্রাস করেছে। এর কয়েকদিন পর তাদের প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য আমরা নৈশ অভিযান চালাই এবং এতে সফল হই। একই সপ্তাহে, ১৩ নভেম্বর অন্য একটি শত্রুবাহিনী যশোর সেক্টরের বয়রার কাছে সীমান্ত অতিক্রম করে। সেখানে ৭ দিন যাবৎ তাদের এই অবস্থান টের পাওয়া যায়নি এবং এই সময়ের মধ্যে ভারতীয়রা সেখানে দুটি পূর্ন ব্যাটেলিয়নশক্তি (জম্মু কাশ্মির ব্যাটেলিয়ন এবং ২ শিখ লাইট ব্যাটেলিয়ন) সংগঠিত করে। বহু দেরী করে ১৯ নভেম্বর আমরা তাদের এই উপস্থিত টের পাই। যশোরের স্থানীয় বিগ্রেডকে অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২২ ও ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দুটি কোম্পানীকে আক্রমনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

আক্রমন ব্যার্থ হয়ে যায় এবং এতে আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে শত্রুরা আমাদের ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈন্যদের উপর হামলা চালায় এবং আমাদের সৈন্যরা সব সরঞ্জাম ফেলে রেখে নিজেদের প্রতিরক্ষা ছেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনা থেকে প্রমান হয় যে, একদিকে আমাদের সৈন্যরা নিজেদের অবস্থান ক্ষমতা হারিয়েছে, অন্যদিকে শত্রুরা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত। এখান থেকে শত্রুকে উচ্ছেদ করতে হলে সত্যি সত্যি জবরদস্ত উদ্যোগের প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী নতুন করে আক্রমনের জন্যে বিদ্যমান ডিভিশনের সঙ্গে আমরা ২১ পাঞ্জাব (আর এ্যান্ড এম) এবং ৬ পাঞ্জাবের ডিভিশনাল সৈন্য যোগ করি। আলফা ও রেভো নামের দুই টাস্ক বাহিনী সংগঠিত করে যথাক্রমের লেফট্যানেন্ট কর্নেল ইমতিয়াজ ওয়ারাইচ এবং লেফট্যানেন্ট কর্নেল শরীফের অধিনায়কত্বে এদের ন্যাস্ত করা হয়। এছারাও দেওয়া হয় এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক এবং এক রেজিমেন্ট গোলন্দাজ শক্তি।

২১ নভেম্বর ভোর ৬ টায় আক্রমন চালানো হয়। শুরুতে আমরা বেশ সাফল্য লাভ করি। কিন্তু আমরা যখন আক্রমন করতে করতে বৃক্ষরাজীর মধ্যে দিয়ে শত্রুদের অবস্থানের দিকে আরও অগ্রসর হতে থাকি তখন গুপ্ত অবস্থান থেকে শত্রুট্যাংকের গোলা আসতে আরম্ভ করে। এটা আমাদের জন্যে ছিল বড় রকমের একটা বিস্ময়। কারন ঐ এলাকাকে আমরা ট্যাংক মোতায়েনের জন্য অনুপুযক্ত বলে ধরে নিয়েছিলাম। শত্রুপক্ষের গোলন্দাজ বাহিনীও সীমান্তের ওপার থেকে এ যুদ্ধে যোগ দেয়। আমরা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাহায্য চেয়ে পাঠাই। অচিরে তিনটি স্যাবার জেট আমাদের মাথার উপর এসে পৌছায়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মিগের আগমন ঘটে এবং এই মোকাবেলায় আমরা দুটি বিমান এবং সবকয়টি ট্যাংক হারাই। ফলে আমাদের অভিযান প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তবে শত্রুরা এই স্থান থেকে চলে না যাওয়ায় তাদেরকে আরও বিস্তার লাভ থেকে বিরত রাখবার জন্য আমরা তিন দিক থেকে তাদের ঘিরে রাখি। ৩ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই ঘেরাও অব্যাহত থাকে। কৌশলগতভাবে আমরা শত্রুর হাতে মার খাওয়া সত্বেও এটাকে চূড়ান্ত সফল অভিযান বলে ঢাকঢোল পেটানো হয়। বরঞ্চ এইভাবে বড় একটা শক্তি এই একটিমাত্র ক্ষত এলাকায় আটকা পড়ে থাকবার কারনে আমাদের অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত এলাকাগুলোতে ভারতের দিক থেকে জোরাল আঘাত আসবার আশংকা বেড়ে যায়। তবে সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুদের লক্ষ্য তখনও ছিল সীমিত।

বাইরে আমরা প্রচার করতে থাকি যে ২১ নভেম্বরের যুদ্ধ ছিল আমাদের উপর মিগ, সাজোয়া, ও গোলন্দাজ বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে ভারতের হামলা। কিন্তু আসলে এটা ছিল ১০ নভেম্বর থেকে দখলকৃত আমাদের এলাকা থেকে শত্রুদেরকে সরিয়ে দেবার জন্য আমাদেরই একটা প্রচেষ্টা।

একই সপ্তাহে (২০-২৫ নভেম্বর) ভারত সিলেটের জকীগঞ্জ ও আটগ্রাম, দিনাজপুরের হিলি এবং রংপুর জেলার পঞ্চগড়ে হামলা চালায়। শত্রুরা চেয়েছিল ভবিষ্যৎ অভিযানে বিচরণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহারের

জন্য সীমান্তের কয়েকটি সুবিধাজনক স্থান দখল করে নিতে। কিন্তু আমরা হেড়ে গলায় চিৎকার জুড়ে দিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের উপর সার্বিক সামরিক অভিযান শুরু হয়েছে।

সিলেট ও রংপুর সেক্টর থেকে আমাদের কিছু প্রতিরক্ষা সৈন্য বিতাড়িত হয়। যশোর সেক্টরে যে ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স অবস্থান নিয়েছিল তারা অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এমনকি সাজ সরঞ্জাম, হাড়ি পাতিল পর্যন্ত ফেলে আসতে হয়।

এই তিনটি ঘটনা জেনারেল নিয়াজীকে অগ্নিশর্মা করে তোলে। আমারই সামনে তিনি দোষীদের ভৎসনা করেন এবং নিম্নরুপ আদেশ দেন।

'শতকরা সত্তর ভাগ হতাহত না হওয়া পর্যন্ত পিছুহটা চলবেনা তাও জিওসি স্বয়ং অনুমতি দিলে তবে।' এই মৌখিক আদেশ পরে লিখিতভাবে নিশ্চিত করা হয়।

জেনারেল নিয়াজী ২২ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকদিন সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যান। আমি সবসময়ই তার সফরসঙ্গী। ২৭ নভেম্বর হিলি এলাকা পরিদর্শনকালে জেনারেল নিয়াজী একদল সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। তাদেরকে হিলিতে ভারতীয় হামলা এলাকা দেখবার জন্যে সেখানে নিয়ে যাওয়ার হয়েছিল। সেখানে, আমাদের সীমানায়, ভারতের একটি বিকল ট্যাংক পড়েছিল। সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান ঘরোয়াভাবে প্রায় আধাঘন্টা ধরে চলতে থাকে। শেষে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'সর্বাত্মক যুদ্ধ কখন শুরু হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?' মুরগীর মাংসের প্লেট থেকে মাথা তুলে তিনি বললেন, 'আমার মতে সর্বাত্মক যুদ্ধ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।'

এই জবাব কারও কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। কারন আমরা সবাই জানতাম যে, ভারত যদি বিমান, সাজোয়া আর গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে সত্যি সত্যি তার সর্বাত্মক সামরিক শক্তি নিয়োজিত করত, তাহলে জেনারেল নিয়াজী এই সময় মুরগীর মাংসের প্লেটের মধ্যে মুখ গুজে সাংবাদিকদের সঙ্গে এইভাবে রসিকতা করতে পারতেননা।

সাংবাদিকরা যখন হিলি রওনা হয়ে গেলেন, জেনারেল নিয়াজী তখন শত্রু বিমানের হামলার সামন্যতম ভয় না করে ঢাকার পথে উড্ডয়ন করলেন। যাবার সময় তিনি একজন যুবতী মহিলা সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে গেলেন স্টাফ হাউসে ফিরে গিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকার দেবার জন্যে।

ঢাকাঃ শেষ তৎপরতা- ঢাকার মানসিক সুরক্ষা এবং সীমান্তের ভীত প্রতিরক্ষা যেন পরস্পর নির্ভরশীল। এর একটাতে বাড়তি কমতি হলে অন্যটার ভাগ্য প্রভাবিত হয়ে যায়। এছাড়া অন্যকোন বিষয়কে প্রভাব বিস্তারের জন্যে গুরুত্বপূর্ন বলে মনে করতে হলে সে হবে পশ্চিম পাকিস্তান রণাগঙ্গনে যুদ্ধের অবস্থা। জেনারেল নিয়াজী যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে লাহোর রণাঙ্গনে আমাদের সাফল্যের ভিত্তিহীন সংবাদে যথার্থ একজন কুস্তিগীরের মত আচরণ করতে লাগলেন এবং ৭ ডিসেম্বর নাগাদ ক্রমে ক্রমে বিভ্রান্তির অতলতায় তলিয়ে যেতে লাগলেন। প্রায় ঐ সময় ৯ ডিভিশনকে পরাস্ত করে ভারতীয়রা যশোর ও ঝিনাইদহ দখল করে নেয়, ১৬ ডিভিশনের প্রধান যোগাযোগ রেখার উপর হামলা চালায় এবং কুমিল্লা ও ফেনীর মধ্যবর্তী স্থানে ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশনের নরম পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়। ঐদিন সন্ধ্যায় জেনারেল নিয়াজীকে গভর্নর হাউস থেকে ডেকে পাঠানো হয় যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ডাঃ এ.এম.মলিককে অবহিত করার জন্যে, কারন তিনি নানা রকমের পরস্পরবিরোধী সব খবর পাচ্ছিলেন। জেনারেল নিয়াজীর স্টাফ প্রধান, বিগ্রেডিয়ার বকর সিদ্দিকী যখন সব রণাঙ্গনে বিরোচিত প্রতিরোধের খবর দিচ্ছিলেন, সেই সময় বিভাগীয় ও জেলা সদর থেকে সন্ত্রস্ত বেসামরিক কর্মকর্তারা সৈন্য প্রত্যাহারে পর বেসামরিক জানমালের ব্যপক ক্ষতি সম্পর্কে গভর্নরকে ফোন করছিলেন। গভর্নর তাই মনে করলেন যে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হওয়াই হবে সত্য উদঘাটনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গভর্নর সন্ধ্যায় গভর্নর মালিকের সঙ্গে বৈঠকটি ছিল জেনারেল নিয়াজীর জন্যে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। সরকারীভাবে ও জেনারেল নিয়াজী এমন সব বড়াই করেছেন যা প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ন নয়। যুদ্ধের তো মাত্র চারদিন কেটেছে-এত সকালেই নিজেদের লজ্জার বিষয়গুলো একজন বেসামরিক গভর্নরের কাছে স্বীকার করা কি উচিত হবে? নাকি এখনও বীরত্ব আর বিজয়ের কাহিনী শুনিয়ে যাবেন? কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্নঃ আর কতকাল এইভাবে গভর্নর, সরকার ও জনগনকে বোকা বানিয়ে রাখা যাবে?

গভর্নর মালিক, জেনারেল নিয়াজী ও আরও দুজন সিনিয়র অফিসার গভর্নর হাউসের একটি আরামপ্রদ কক্ষে আলোচনায় বসলেন। তারা বেশি কথা বললেন না। কথার চাইতে নিরবতাই বেশি লক্ষ্য করা গেল। সেই কথাটুকুর বেশির ভাগ আবার বললেন গভর্নর নিজে এবং তাও নির্বিশেষভাবে। আলোচনার মূল বিষয় ছিলঃ অবস্থা সব সময় এক থাকেনা। অবস্থা ভাল থেকে খারাপ হয়, আবার খারাপ থেকে ভালোও হয়। অনুরূপভাবে, একজন জেনারেলের কর্ম জীবনের উত্থান-পতন থাকে। একসময় সাফল্য তাকে মহিমান্বিত করে, আবার অন্য সময় হয়ত পরাজয় তার মর্যাদাকে খাটো করে দেয়। ডাঃ মালিক এই শেষের বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিশালদেহী জেনারেল নিয়াজী কেপে উঠলেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি দুহাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে শিশুর মত ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদতে লাগলেন। গভর্নর ঠিক বড় ভাইয়ের মত করে জেনারেল নিয়াজীর গায়ে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমি জানি, জেনারেল সাহেব একজন কম্যান্ডারের জীবনে এমনি কঠিন দিন আসে। কিন্তু সেজন্য মন খারাপ করবেন না। আল্লাহ মহান।'

জেনারেল নিয়াজী যখন কাদছিলেন তখন একজন বাঙ্গালী ওয়েটার ট্রেতে করে কফি ও স্ন্যাক নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ থেকে চীৎকার করে এমনভাবে বের করে দেওয়া হয় যেন সে কক্ষের পবিত্রতা হানি করেছে। বেড়িয়ে গিয়ে সে তার বাঙ্গালী সঙ্গীদের কাছে জানায়, 'সাহেবরা ভেতরে

কাদছেন'। এই মন্তব্য গভর্নরের পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক সচিবের কানে যায় এবং তিনি বাঙ্গালীদের এনিয়ে উচ্চবাচ্য করতে নিষেধ করেন।

গভর্নর মালিক এইভাবেই পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধের সর্বাধিক সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য লাভ করলেন। কান্নাকাটির জন্যে সমবেদনা জানাবার পালা শেষ হলে তিনি জেনারেল নিয়াজীকে বললেন, 'পরিস্থিতিটা খারাপ যখন, তখন আমি ভাবছি যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করার জন্যে প্রেসিডেন্টের কাছে আমার তার পাঠানো উচিত।' জেনারেল নিয়াজী মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত থেকে মাথাটা নিচু করলেন, তারপর ক্ষীণকন্ঠে বললেন, 'আমি কামনা করব।' তদনুযায়ী ইয়াহিয়া খানের কাছে গভর্নর একটি তারবার্তা পাঠালেন। কিন্তু তার এই প্রস্তাবের ওপর কোনই ব্যবস্থা গৃহীত হল না।

জেনারেল নিয়াজী তার সদর দফতরে ফিরে এসে নিজের ঘরে স্বেচ্ছা-বন্দীত্ব গ্রহন করলেন। তিনি এরপর তিনরাত বস্তুতঃ আত্মগোপন করে থাকলেন। এই সময়, ৮-৯ ডিসেম্বরের রাতে আমি তার কক্ষে যাই। তখন পর্যন্ত আমি গভর্মেন্ট হাউস বৈঠকের কথা জানতে পারিনি। দেখলাম তিনি হাতের উপর হাত রেখে আছেন এবং মুখ সম্পূর্ন ঢাকা। আমি বলতে পারব না তিনি কাদছিলেন কিনা। আমাদের সংক্ষিপ্ত আলাপের মধ্যে তার আলাপটুকু শুধু আমার এখনও মনে আছে। বললেন, 'সালিক, তোমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে, আজ তুমি জেনারেল নই।' একথাতে তার প্রচন্ডা যন্ত্রণাই প্রকাশ পেল। আমি সেখান থেকে চলে গেলাম, কিন্তু সারারাত ধরে তার কথাগুলো আমার কানের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল এবং তার জন্যে আমার করুণা হল।

৭,৮, ও ৯ ডিসেম্বর এই তিনদিন ছিল জেনারেল নিয়াজীর জন্যে বড়ই দুঃসময়। ঐসময় সব ডিভিশনই তাদের সঙ্গতি হারিয়ে ফেলে। এদের অধিকাংশই নিজেদের দুর্ভেদ্য এলাকা ছেড়এ আরও অনেক পিছনে সরে আসতে বাধ্য হয়। আরও দুঃখের কথা যে, পূর্ব পাকিস্তানের এতসব ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হওয়ার মত লাভজনক কোন কিছুই পশ্চিম পাকিস্তান রণাঙ্গনে সংঘটিত হয়নি। এখন জেনারেল নিয়াজীর সব উচ্ছ্বলতার অবসান ঘটেছে এবং যে রসিকতার জন্যে তিনি এত বিখ্যাত তাও আর নেই। তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না এবং সবসময় বিমর্ষ থাকেন। তার চোখে অনিদ্রার স্পষ্ট ছাপ। স্পষ্টতই দায়িত্বের বোঝা তিনি যেন আর বইতে পারছেন না।

এদিকে বিশেষভাবে অল-ইন্ডিয়া এবং সাধারনভাবে অন্যান্য বিদেশী সম্প্রচারকেন্দ্র আমাদের বিড়ম্বনার কাহিনী অতিরঞ্জিত করে প্রচার করতে লাগল। তেমনি আবার আমাদের রেডিও পাকিস্তান, আমাদের সাফল্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত খবর প্রচার করে তাদেরকে হারিয়ে দিতে চাইল। দূর্ভাগ্যবশত শ্রোতাদের বিশেষ করে বাঙ্গালী শ্রোতাদের অল-ইন্ডিয়া রেডিও ও অন্যান্য কেন্দ্রের সম্প্রচারের উপর রেডিও পাকিস্তানের চেয়ে বেশী আস্থা।

এই একই সময় বিবিসি ঘোষনা করল যে, জেনারেল নিয়াজী তার সৈন্যদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে পশ্চিম পাকিস্তান পালিয়ে গেছেন। এই খবর তার ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে এবং এতে তিনি খুবই তিক্ত অনুভূতি লাভ করেন। ১০ ডিসেম্বর তিনি হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হন এবং লাউঞ্জে প্রথম যে লোকটার সঙ্গে দেখা হয় তাকে তিনি বলেন, 'কই বিবিসির লোক কোথায়?' আমি তাকে দেখাতে চাই যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কৃপা আমি এখনও পূর্ন পাকিস্তানে আছি। আমি কখনই আমার বাহিনীকে ছেড়ে যাবনা।' এই ঘোষনার পর তিনি তার সদর দফতরে ফিরে আসেন।

অবশ্য জেনারেল নিয়াজীর ঢাকার উপস্থিতি সত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তার অযোগ্যতা সম্বন্ধে বিদেশীদের মনে কোন আস্থা জাগল না। ডুবন্ত জাহাজ থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে ঝাপ দেওয়ার মত তাদের এই অবস্থা। তারা পালিয়ে বাচতে চায়। জাতিসংঘ ৮ ডিসেম্বর তাদের জন্যে বিমানযাত্রার ব্যবস্থা করে। কিন্তু তখনও রানওয়ের বিশ্রী অবস্থা এবং ভারতীয় বিমান বাহিনী দিনে কমপক্ষে তিনবার করে বিমানক্ষেত্রের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত ও পাকিস্তান কতৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করার পর কিছুদিনের মধ্যএ তারা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে।

অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব কেবল যে পলায়নের পর বিদেশী বা শত্রুভাবাপন্ন বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে সীমিত ছিল তা নয়, বরং কিছু সেনা অফিসারের মধ্যেও আতঙ্ক বাসা বাধল। এদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটা তকম আটা দুজন অফিসার আমার কাছে এসে বললেন, 'জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে তো আপনার বেশ খাতির। আপনি তার কাছে গিয়ে একটু বলুন না কেন বাস্তববাদি হতে। নইলে আমরা যে সবাই কুকুরের মত মারা পড়ে থাকব।' আমি বললাম যে, যুদ্ধের মত একটা সেনসেটিভ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একজন কোর-কম্যান্ডারকে প্রভাবিত করাটা আমার মত সামান্য একজন জনসংযোগ অফিসারের পক্ষে খুব বেশি বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে। আমি জেনারেল নিয়াজীকে কিছু বলিনি।

তবে ৮-৯ ডিসেম্বর রাতে জেনারেল নিয়াজীর ট্যাকটিকাল সদর দফতরের সীমানা প্রাচীরের কাছে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আমার দেখা হলে তখন এসব অফিসারের মনোভাব তার কাছে ব্যক্ত করি। তিনি বললেন, 'হ্যা সরকারও উদ্বিগ্ন। তবে পূর্ব কম্যান্ডের অধিনায়কের কিছু বিশেষ বিবেচ্য বিষয় আছে। তবু এব্যাপারে কিছু করব।'

পরের দিন গভর্নর প্রেসিডেন্টের কাছে একটি বার্তা সঙ্কেত পাঠান। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এতে বলা হয়, 'আরও একবার আমি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং রাজনৈতিক নিষ্পত্তির বিষয় বিবেচনার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি'। ইয়াহিয়া খান বিষয়টিকে আবার উপেক্ষা করলেন, কারণ ঘটনার উপর নির্ভরযোগ্য সামরিক রিপোর্টের জন্যে প্রকৃত ব্যাক্তি হলেন জেনারেল নিয়াজী। তিনি যতদিন আস্থাবান, ততদিন রাজনৈতিক খুটি ধরবার দরকার নেই। কিন্তু ৯ ডিসেম্বর সকালে ব্যাপারটা ঘটল, যখন পূর্ব কম্যান্ডের সদর দফতর এই প্রথমবারের মত স্বীকার করল যে, পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটজনক বটে। তখন নিম্নরূপ বার্তা-সঙ্কেত পাঠানো হলঃ

এক। আকাশা যুদ্ধের শত্রুর প্রবল আধিপত্যের জন্যে এখন আর পূনর্বিন্যাস সম্ভব নয়। জনতা প্রবলভাবে বৈরী হয়ে উঠেছে এবং শত্রুবাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্য করছে। বিদ্রোহীদের ব্যাপক অতর্কিত হামলার জন্যে নৈশ অভিযান আর সম্ভব নয়। ফাক বুঝে ও পেছন থেকে বিদ্রোহীরা শত্রুকে পরিচালিত করছে। বিমানক্ষেত্র দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। গত তিনদিন কোন অভিযান চালানো যায়নি এবং ভবিষ্যতেও যাবেনা। এমনকি অব্যাহতি লাভও খুবই কঠিন।

দুই। শত্রুর বিমান হামলায় অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সৈন্যরা বীরবিক্রমে লড়াই করে যাচ্ছে কিন্তু চাপ এবং যন্ত্রণাও খুব বেশি হচ্ছে। কুড়ি দিন যাবৎ নিদ্রা নেই। বিমান, গোলন্দাজ ও ট্যাংকের অবিরাম হামলার মুখে আছি।

তিন। পরিস্থিত অত্যন্ত সঙ্কটজনক। আমরা যুদ্ধ ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

চার। অনুরোধ, এই অঞ্চলে শত্রুর সমস্ত বিমান ঘাটির উদ্বেগকে পুষ্ট করল। কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই পরিস্থিতিতে বিমানযোগে সৈন্য পাঠান।

জেনারেল নিয়াজীর তারবার্তা এই প্রথম গভর্ন্র মালিকের উদ্বেগকে পুষ্ট করল। কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পরিস্থিতি অনুধাবন করলেন এবং তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যে তিনি প্রাদেশিক গভর্নরকে ক্ষমতা দিলেন। ঐ রাতেই গভর্নর এবং পূর্ব কম্যান্ডের অধিনায়কের কাছে প্রেসিডেন্ট যে তার পাঠালেন, তার প্রধান অংশ নিম্নরূপঃ

প্রেরক প্রেসিডেন্ট, প্রাপক গভর্নর, প্রতিলিপি পূর্ব কম্যান্ড। আপনার জরুরী বার্তা পেয়েছি এবং পূর্ন উপলব্ধি লাভ করেছি। আমাকে দেওয়া আপনার প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্যে আমি আপনাকে অনুমতি দিলাম। আমি আন্তর্জাতিকভাবে সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং করে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা পরষ্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের উপর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি আপনার শুভবুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতার উপর সবকিছু ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার যে কোন সিদ্ধান্ত আমি অনুমোদন করব আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেবার জন্যে এবং সেই মত সবকিছু আয়োজন করার জন্যে আমি জেনারেল নিয়াজীকে উপদেশ দিচ্ছি।

এই বার্তার পর আরেকটি বার্তা আসে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান জেনারেল আবুল হামিদ খানের কাছ থেকে জেনারেল নিয়াজীর কাছে। এতে প্রেসিডেন্টের বার্তার প্রধান বিষয়গুলো পুনরুল্লেখ করা হয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহায্যের জন্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির সঠিক হিসেব গভর্নরের কাছে পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। হামিদ তাকে সর্বাধিক পরিমান অস্ত্র ও সরঞ্জাম ধংশ করে ফেলার পরামর্শ দেন যেন তা শত্রু হাতে না পড়ে। এর আগে ১০ ডিসেম্বরে পাঠানো জেনারেল হামিদের তারবার্তাঃ

প্রেরক সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান, প্রধান অধিনায়ক। সূত্র গভর্নরের কাছে প্রেসিডেন্টের সঙ্কেত বার্তা ও আপনার কাছে তার প্রতিলিপি। আপনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরামর্শক্রমে গভর্নর কর্তক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্বের মাত্রা সঠিকভাবে বোঝাবার মত উপযুক্ত কোন সঙ্কেত না থাকায় সরেজমিনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমি আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। স্পষ্ট যে সংখ্যা ও সরঞ্জামের দিক থেকে বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিদ্রোহিদের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে শত্রু যে পূর্ব পাকিস্তানের উপর সম্পূর্ন আধিপত্য বিস্তার করবে এখন সেটা কেবলই সময়ের ব্যাপার। ইতোমধ্যে বেসামরিক নাগরিকদের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে এবং লোক যথেষ্ট হতাহত হচ্ছে। লড়তে পারবেন কিনা, সে মূল্যায়ন আপনাকে করতে হবে। এর ভিত্তিতে আপনি আপনার সুস্পষ্ট পরামর্শ গভর্নরকে প্রদান করবেন গভর্নর তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে। যখনই আপনি সেরকম করার প্রয়োজন বোধ করবেন, যেন তা শত্রুর হাতে গিয়ে না পড়ে। আমাকে অবহিত রাখুন। আল্লাহ আপনার সহায় হোন।

এখন যেহেতু গভর্নর এ.এম.মালিকের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে, তাই প্রশ্ন দাড়াচ্ছে, কুল রক্ষার জন্যে কি ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করবেন। যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তার নেই। জেনারেল নিয়াজীর যদি লড়াই চালিয়ে যাবার সাধ্য থাকত, তাহলে তো উপরের বর্ণিত বার্তা বিনিময়ের কোন প্রয়োজন ছিলনা। আর, নিয়াজী যদি মনোবল হারিয়ে থাকেন তাহলে সেই মনোবল চাঙ্গা করতে গভর্নরের কি-ই বা করণীয় থাকতে পারে। সুতরাং ডাঃ এ.এম.মালিক এমন একটি যুদ্ধ বিরতির কথা ভাবলেন, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক নিষ্পত্বি আনা যায়, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে সরকার চালানো যায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে ভারতীয় ও পাকিস্তানী বাহিনী সরিয়ে নেওয়া যায়। এজন্যে মধ্যাস্থকারী মনোনীত করা হল জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরীকে যিনি তখন ঢাকায় ছিলেন।

মিস্টার হেনরীকে হাতে যখন চিঠি দেওয়া হয়, তখন গভর্নরের সঙ্গে ছিলেন তার উপদেষ্টা মেজর জেনারেল ফরমান আলী এবং মুখ্য সচিব মুজাফফর হোসেন। ১০ ডিসেম্বর ডাঃ মালিকের পাঠানো বার্তায় প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করা হয়।

প্রাপকঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। যেহেতু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমার উপর অর্পিত হয়েছে সেহেতু আমি আপনার অনুমোদনের পর সহকারী মহাপরিচালক মিস্টার পল মার্ক হেনরীকে নিম্নরুপ চিঠি প্রদান করছি। চিঠি আরম্ভঃ পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে সর্বাত্মক যুদ্ধের মধ্যে পাকিস্তানের পরিস্থিতির উদ্ভব হল, যাতে সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল। পাকিস্তানের সরকার সর্বদাই রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাসমূহ নিষ্পন্ন করতে চেয়েছেন যার জন্যে আলাপ আলোচনাও হয়েছে। প্রচন্ড প্রতিকূলতা সত্বেও সশস্ত্রবাহিনীসমূহ বীরোচিত যুদ্ধ লড়েছেম, এবং তারা এখনো লড়ে যেতে সক্ষম কিন্তু আরও রক্তপাত ও নিরীহ লোকদের প্রাণহানি এড়াবার উদ্দেশ্যে আমি নিম্নরুপ প্রস্তাব করছি। যেহেতু রাজনৈতিক প্রশ্নের দরুন বিরোধ দেখা দিয়েছে সেহেতু তার সমাধানও অবশ্যই রাজনৈতিক হতে হবে। সুতরাং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে এতদ্বারা ঢাকায় শান্তিপূর্নভাবে সরকার

গঠনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আহবান জানাচ্ছি। এই প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি একথা জানানো কর্তব্য বলে মনে করছি যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের মাটি থেকে ভারতীয় বিমানবাহিনীসমূহেও আশু প্রত্যাহার দাবী করবেন। সুতরাং আমি জাতিসংঘকে শান্তিপূর্ন ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করার আহবান জানাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি, একঃ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি। দুইঃ পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সসম্মানে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে আগ্রহী তাদের প্রত্যাবর্তন। চারঃ ১৯৪৭ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসতিগ্রহণকারী সব ব্যাক্তির নিরাপত্তা। পাচঃ পূর্ব পাকিস্তানে যে কোন ব্যাক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার নিশ্চয়তা। এই প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই যে, এ হচ্ছে শান্তিপূর্ন ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা সুনিশ্চিত প্রস্তাব। সশস্ত্রবাহিনীসমূহের আত্মসমর্পণের প্রশ্ন বিবেচ্য নয় এবং সে প্রশ্ন ওঠে না এবং এই প্রস্তাব গৃহীত না হলে সশস্ত্রবাহিনীসমূহ শেষ লোক ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত লড়ে যাবে। চিঠি সমাপ্ত। জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা হয়েছে এবং তিনি আপনার অধিনায়কত্বে নিজেকে সমর্পন করেছেন।

যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাব একবার যখন জাতিসংঘের কাছে চলে গেল, তখন সে প্রস্তাবকে অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে আর গোপন রাখার প্রশ্ন ওঠে না। কোন কোন গুরুত্বপূর্ন বৈদেশিক বেতারকেন্দ্র থেকে এর বিষয়বস্তু সম্প্রচারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘে পাকিস্তানের বক্তব্যের গুরুত্ব খাটো হয়ে যায়। যেখানে নবনিযুক্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব জেড.এ. ভুট্টো আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে ওকালতি করছিলেন। এর পরিনামস্বরুপ রাওলাপিন্ডিতে একজন সরকারী মুখপাত্র যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সরাসরি অস্বীকার করে বসেন। ১৩ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমি চ্যানেঞ্জ দিচ্ছি যে কেউ এমন কোন দলিল বা বিবৃতি পেশ করুন যাতে অস্তিত্ব সমপর্নের ধারনা যুক্ত করা হয়েছে।' ঢাকাকে অবহিত করা হয় যে, তোমাদের প্রস্তাব খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে' এবং তোমাদের সংযুক্ত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নেবে, এই রকমই আশা করা হয়েছিল।'

মেজর জেনারেল ফরমান আলী (সাধারনভাবে যাকে এই প্রস্তাবের প্রণেতা বলে বিবেচনা করা হয়) পরে আমাকে বলেছিলেন যে, 'এর উদ্দেশ্য একমাত্র এই ছিল যে, যুদ্ধবিরতীর সুযোগে আমাদের অধিনায়কেরা নিজেদের বাহিনীসমূহকে পুনর্গঠিত করে নেবেন এবং নিজেদের ক্ষমতা পুনুরুজ্জীবিত করবেন। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠন বলতে আ,রা যা বুঝিয়েছি তা হচ্ছে, এই যে, সভ্য পাকিস্তানীমনা সকল বাঙ্গালী এম.এন.এ ও এম.পি এ যারা ১৯৭০ এর ডিসেম্বরের সাধারন নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন বা ভবিষ্যতে কখনও নির্বাচিত হবেন, তারাই ক্ষমতায় বসবেন। ভারত যদি এটাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করে এবং আবার বৈরিতা শুরু করে তাহলে আমরা নতুন উদ্যম নিয়ে আবার তার মোকাবেলা করব।'

প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, রাওয়াল পিন্ডিতে সরকারী মুখপাত্র তার নিন্দা করায় যুদ্ধবিরতির প্রশ্নটা আপাততঃ শিকেয় উঠল। ইয়াহিয়া খান সম্ভবত জনাব ভুট্টোকে আরও কিছু সময় দিতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি বিশ্ব প্রতিষ্ঠানে তার কূটনৈতিক নৈপূন্য দেখানোর সুযোগ লাভ করেন। তাকে জানানো হয়যে, বাইরে থেকে নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন সংগ্রহ করা হচ্ছে-বিশেষত 'উত্তর থেকে হরিদ্রবন এবং দক্ষিত থেকে শ্বেতবলয়' পাকিস্তানের পক্ষে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে। ঢাকা এই বক্তব্যের পরিষ্কার অর্থ করল যে, চীন ও আমেরিকা সাহায্য দেবে, যেন ভারতের পক্ষে সোভিয়েত সমর্থনকে কাটিয়ে ওঠা যায়। এই চমৎকার খবরটা শেষ পর্যন্ত সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তারা সব সেক্টরে চরম চাপের তলায় নিষ্পেষিত। তাদের পর্যদুস্ত মনোবলকে চাঙ্গা করবার লক্ষ্য নিয়েই এই খবর ছড়ানো হয়। টাঙ্গাইলের কাছে ভারতীয় ছত্রীসৈন্য নামতে দেখে বিগ্রেডিয়ার কাদিরের অধীন পলায়নরত ১৩ বিগ্রেড সেই ছত্রীসৈন্যকে আকাঙ্খিত সাহায্য মনে করে বিভ্রান্তির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় একি সময় ঢাকায় ট্যাকটিকাল সদর দফতরে আমি একজন সেনাপতির পরিচারককে দেখালম তার দুই ব্যান্ডের ট্রানজিষ্টার রেডিও মেরামত করতে। তার পাশ দিয়ে আমি যখন এগিয়ে যাচ্ছিলাম, সে উঠে দাড়ালো এবং এলিয়ে পড়া টুপিটাকে ঠিক করে নিয়ে আমাকে অভিবাদন জানাল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'খবর কি?' সে উদাসভাবে বলল, 'চীন বা আমেরিকার সাহায্যের কই কোন খবরতো দেখছিনা!'

রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রচারিত ধোকাবাজির খবরটায় কিছু সাময়িক ফল হয়েছে। সৈনিকরা আকাশে দিকে তাকিয়ে থাকছে (অর্থ্যাৎ চীনরা বিমান পাঠাল কিনা) এবং সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করছে (অর্থ্যাৎ মার্কিন রণতরী ভিড়ল কিনা)। এইভাবে তারা সময় কাটাতে লাগল, কখন বন্ধুদের সাহায্য এসে পৌছায়। কিন্তু হা-হতষ্মি কোন সাহায্যই এল না।

পূর্ব কম্যান্ডের সদর দফতর থেকে রাওলাপিন্ডিতে নির্ভরযোগ্য মহলের কাছে অধীর আগ্রহে টেলিফোন করা হচ্ছে জানবার জন্যে বন্ধুদের হস্তক্ষেপের শেষ খবরটা কি। উত্তরে সবাই জানাচ্ছে শীঘ্রই আসছে। প্রত্যক্ষ কোন ফল ছাড়া এইভাবে পূর্ন ৪৮ ঘন্টা যখন কেটে গেল, তখন রাওলাপিন্ডির জেনারেল হেডকোয়ার্টারে আবার টেলিফোন করা হল। আবার উত্তর এল, শীঘ্রই আসছে। ক্রোধান্বিত একজন স্টাফ অফিসার এই আলাপ শুনতে পেয়ে বললেন, 'জিজ্ঞেস করো এই শীঘ্রটা কখন আসবে।'

ঢাকায় চীন ও আমেরিকার কূটনৈতিক প্রধানদের সঙ্গেও পৃথক পৃথকভাবে যোগাযোগ করা হয়। তারা তাদের সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন উদ্দোগ গ্রহণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই গুজব নিয়ে জেনারেল নিয়াজী নিজে জেনারেল ইয়াহিয়া কিংবা জেনারেল হামিদের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেননা।

শেষে পূর্বাঞ্চল কম্যান্ড থেকে রাওলাপিন্ডিতে প্রশ্ন করা হল, 'সুনির্দিষ্টভাবে বলুন, আর কতকাল বন্ধুদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?'

উত্তর এল, 'আরও ছত্রিশ ঘন্টা।'

এই নতুন সময় সীমা তাহলে দাড়াচ্ছে ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা। এদিকে সামরিক তৎপরতাজনিত অবস্থার আরও অবনিত ঘটতে লাগল, ৯ ডিভিশনের ৫৭ বিগ্রেড হার্ডিঞ্জ সেতু অতিক্রম করেছিল তো করেছিল। ১৬ ডিভিশন সিলেট ও ভৈরব বাজারে আটকা পড়ে যায়। ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশনাল সদর দফতরের আর কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৩৬ অস্থায়ী ডিভিশনের একমাত্র বিগ্রেডটি ঢাকা ফিরবার পথে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সমস্ত ডিভিশনাল সেক্টর বহুধাবিভক্ত হয়ে যায়, যার ফলে ঢাকা দখলের জন্য শত্রুর পক্ষে যথেষ্ট ফাক ও ফাটল সৃষ্টি হয়ে যায়।

যাই হোক, বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হলে শত্রু তখনও ঢাকার নাগালের বাইরে। তারা কেবল নরসিংদিতে একটা হেলি কপ্টারবাহী কোম্পানী এবং টাংগাইল এলাকায় একটি ছত্রী ব্যাটেলিয়ন রয়েছে। মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) কিং গঙ্গা (পদ্মা) এর ওপর থেকে স্থলবাহিনী এসে যোগান না দেওয়া পর্যন্ত এই দুই বিচ্ছিন্ন কাহিনি প্রাদেশিক রাজধানীর জন্য আদৌ কোন হুমকি হতে পারেনা। ঢাকা দখল করতে হলে ভারতকে নিজ দেশ থেকে আরও অনেক সৈন্য আনতে হবে। বিভিন্ন নদীর উপর সেতু তৈরী করতে হবে কিংবা ট্যাংক, সাজোয়া ও অন্যান্য ভাঙ্গ সরঞ্জাম বইবার জন্য বহু নৌযানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া তাকে নদ-নদীর বাধা আয়ত্তে আনতে হবে এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন সামরিক শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। সুতরাং সংরক্ষনশীল হিসাব কষে দেখলেও বোঝা যায়, এইসব শক্তি সংগ্রহ করে চূড়ান্ত আঘাত হানতে হলে ভারতের অন্ততঃপক্ষে আরও এক সপ্তাহ সময় লাগবে।

ঢাকার চারপাশে শত্রুর বিপুল সমাবেশ ঘটেছে বলেই যে পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড দিশেহারা হয়ে পড়েছে তা নয়। তার দিশেহারা হবার কারন হচ্ছে সে জানে হামলা হবেই এবং ঢাকাকে রক্ষা করবার মত নিয়মিত বাহিনী তার নেই। আমি লক্ষ্য করলাম বিগ্রেডিয়ার বকর কী মরিয়া হয়েইনা আকুতি জানাচ্ছেন, ঢাকাকে রক্ষার জন্য আমাকে একটা বিগ্রেড দাও, কিংবা নিদেনপক্ষে একটা ব্যাটেলিয়ন দাও, দোহাই তোমাদের। তিনি বিগ্রেডিয়ার আতিফকে বললেন, কুমিল্লা দূর্গ ছেড়ে দাও এবং তোমার বাহিনীকে ঢাকার পূর্ব পাশে মোতায়েন করো। কিন্তু আতিফ তার নিজ হাতে গড়া নিরাপদ একটা প্রতিরক্ষার আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেননা। তেমনি মেজর জেনারেল কাজীকে যখন ভৈরব বাজার থেকে চলে আসতে বলা হল তখন তিনি তা মান্য করতে পারলেননা কারন যাবার জন্য নৌ-পরিবহনের বড়ই অভাব। মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহকে ৫৭ বিগ্রেড (মূলত ৯ ডিভিশন থেকে গঠিত) পাঠিয়ে

দেবার অনুরোধ জানানো হল, কিন্তু তিনি তা পাঠালেন না। তিনি পাঠালেন মাত্র একটা ব্যাটেলিয়ন এবং সেই ব্যাটেলিয়নও যমুনা পার হতে ব্যার্থ হয়। ঠিক এমনি অসহায় অবস্থায় মেজর জেনারেল জামশেদ জামালপু-ময়মনসিং এলাকা থেকে ৩৯ বিগ্রেডকে প্রত্যাহার করে ঢাকার উত্তরাঞ্চলে মোতায়েনের আদেশ দিলেন। তিনি টেলিফোনে বিগ্রেডিয়ার কাদিরের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন, পাছে তিনিও এই আদেশ অমান্য করবার জন্যে কোন ছল-ছাতুরীর আশ্রয় গ্রহন করেন। বিগ্রেডিয়ার কাদিরই হলেন একমাত্র অধিনায়ক যিনি উর্ধতন অফিসারের ইচ্ছা পূরন করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আসবার পথে তার বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পরিস্থিতি ক্রমাগতভাবে অতিদ্রুত খারাপ হয়ে যাওয়ার সত্বেও জেনারেল নিয়াজী তখনও বিশ্বাস করছেন যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে এবং সেই অনুযায়ী তিনি বলিষ্ঠ আচরন প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। ১১ ডিসেম্বর তিনি মোটরযোগে স্থানীয় সামরিক হাসপাতাল এবং ঢাকা বিমানবন্দরে বিমান বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনে যান। আমি তার সঙ্গে ছিলাম। হাসপাতালে জনাকয়েক পশ্চিম পাকিস্তানী সেবিকা তার সামনে এসে দাড়ায় এবং বর্বর মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবার অনুরোধ জানায়। তিনি তাদেরকে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করেন, কারন বৃহৎ সাহায্য এসে গেলো বলে। তিনি জানান যে সাহায্য যদি নাই আসে তাহলে মুক্তিবাহিনীর পড়বার আগে আমরাই তোমাদেরকে মেরে ফেলব।

সেখান থেকে তিনি চলে যান বিমানবন্দরে এবং কয়েকটি কামানের অবস্থান পরিদর্শন করেন। সেখানকার জওয়ানদের তিনি উৎসাহসূচক কথা বলেন, তবে জানান, 'তোমাদের অবস্থানের সামনের মাটির দিকে নজর রেখো। তোমাদের ব্যাক্তিগত অস্ত্র যেন সবসময় প্রস্তুত থাকে।' এরপর সেনানিবাসে ফিরবার সময় বেশ বড়সড় একদল বিদেশী সাংবাদিককে তিনি ঢাকা বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষমান দেখতে পান, যারা ব্যাংকক যেতে চায়। তার বিরুদ্ধ স্বপক্ষ ত্যাগের যে গুজব ছিল, সেটাকে খন্ডন করার এটা একটা চমৎকার সুযোগ বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু সাংবাদিকরাই একের পর এক অজস্র প্রশ্নবানে তাকে বিদ্ধ করতে থাকে। তিনি ঝাপসা, তিক্ত ও এড়িয়ে যাওয়া উত্তর দিয়ে দায় সারেন। এর মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর ছিল নিম্নরূপঃ

প্রঃ ভারত দাবী করছে যে, তার বাহিনী ঢাকার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। সত্যি সত্যি তারা কতদূর পর্যন্ত এসেছে?

উঃ আপনি নিজে গিয়ে সেটা দেখে আসুন।

প্রঃ আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?

উঃ আমি শেষ লোকটি, শেষ গুলিটি পর্যন্ত লড়ব।

প্রঃ ভারতীয়দেরকে ঢাকার বাইরে ঠেকিয়ে রাখবার মত যথেষ্ট সৈন্যশক্তি আপনার আছে কি?

উঃ একমাত্র আমার মৃতদেহের উপরই ঢাকার পতন ঘটবে। এটার (নিজের বুক দেখিয়ে) উপর দিয়ে তাদেরকে ট্যাংক চালিয়ে যেতে হবে।

এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতেই থাকল। কোনটার উত্তর দিলেন, কোনটা এড়িয়ে গেলেন। তারপর অতিদ্রুত ফিরে গেলেন তার ভূগর্ভ সদরদফতরে।

১০ থেকে ১৩ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীর মেজাজে সামান্যকিছু আশাব্যাঞ্জক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তখনও তিনি উত্তেজিত কিন্তু সম্পূর্ন ভেঙ্গে পড়েননি। তার হাস্যরস নিভে গেছে কিন্তু কান্নাও নেই। তিনি পুরুষাচিতভাবে সংযম দেখান এবং নিজের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করেন। বৈদিশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ভুয়া হলেও তার প্রভাব তখনও তার মন থেকে কেটে যায়নি।

নিয়াজীর মেজাজের এই পরিবর্তন অবশ্য সামরিক তৎপরতার পরিস্থিতির প্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ১০ ডিসেম্বর নাগাদ দেওয়ালের লিখন এত বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মেজর জেনারেল জামশেদ ঢাকার রক্ষক হিসেবে কর্তব্য পালন করতে শুরু করে দেন। এতে জেনারেল নিয়াজীর অবস্থান আরও অনেক পেছন দিকে সরে যায়।

ঢাকা ও তার উপকন্ঠের একটি নির্বাহন মানচিত্র অভিযান কক্ষের পশ্চিম দেওয়ালে গাথা ছিল। ঢাকার দুই স্তরবিশিষ্ট প্রতিরক্ষা সংগঠনের জন্যে জামশেদ সেই কক্ষে সম্মেলন চালাচ্ছেন। তার ডেপুটি, বিগ্রেডিয়ার বশী আহমদ, নতুন নতুন প্রতিরক্ষা চিন্হিত করবার জন্যে মানচিত্রে ঢাকার চারপাশে গোল গোল আচড় কাটতে থাকেন। মানচিত্রের উপর এইসব আচড় দেখতে বেস ভালোই লাগে। যেন মোচড় খাওয়ার কোবরা সাপ, যেন এখনই শত্রুর গায়ে ছোবল মারবে যদি শত্রু তাকে স্পর্শ করবার সাহস রাখে।

কাগুজে ব্যবস্থা অনুযায়ী ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্যে থাকবে বহিঃসীমানা আর অভ্যন্তরীন সীমানা। বাইরের পর্যায়ে সৈন্যরা শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে। এই কাজ তারা করবে উত্তর-পশ্চিমে মানিকগঞ্জের রেখা বরাবর, উত্তরে কালিয়াকৈরে, উত্তর-পূর্বে নারায়নগঞ্জে, পূর্বে দাউদকান্দিতে এবং দক্ষিন-পূর্বে মুন্সিগঞ্জে।

আশা করা হয়যে, ৯৩ বিগ্রেড (ময়মনসিংহ), ২৭ বিগ্রেড (ভৈরব বাজার), ১১৭ বিগ্রেড (কুমিল্লা) এবং ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশন (চাদপূর) যথাক্রমে কালিয়াকৈর, নরসিংদি, দাউদকান্দি ও মুন্সিগঞ্জ অবস্থান গ্রহন করবে। কিন্তু এই আশা কখনো আলোর মুখ দেখতে পায়নি। আর, অভ্যন্তরীন প্রতিরক্ষাটা থাকবে মিরপুর সেতু, টঙ্গী, ডেমরা ও নারায়নগঞ্জ বরাবর। ঢাকাগামী এই পশ্চিমে, উত্তর ও পূর্বমুখী পথগুলোর

দায়িত্বে থাকবেন কর্নেল ফজলে হামিদ, বিগ্রেডিয়ার কাসিম, ও বিগ্রেডিয়ার মনসুর এবং মূল নগরী ঢাকার দায়িত্বে থাকবেন বিগ্রেডিয়ার বশীর।

কিন্তু ঢাকায় কোন সংগঠিত বাহিনী না থাকায় মানচিত্রে প্রদর্শিত শূন্যস্থান ভরাট করার জন্যে নানা বিক্ষিপ্ত উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। আরও একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে অস্ত্র বিভাগ, সেবা বিভাগ, ও আধা সামরিক বাহিনীসমূহের প্রতিনিধিদেরকে তাদের লভ্য সৈন্যসংখ্যা জানাতে বলা হয়। মোট জনশক্তি দাড়ায় পদাতিক, প্রকৌশলী, অস্ত্র, সংকেত তড়িৎ ও যন্ত্র-প্রকৌশলী এবং সেনাবাহিনীর সার্ভিস কোরের প্রতিনিধিত্বকারী লোক নিয়ে প্রায় ১২ কোম্পানী। প্রায় ১৫০০ ই পি সি এ এফ ১৮০০ পুলিশ এবং ৩০০ অনুগত রাজাকার (আল-বদর) এর সঙ্গে যোগ করা হয়। এরফলে সর্বমোট সংখ্যা দাড়ায় ৫০০০। এই জগাখিচুড়ি বাহিনীর অধিনায়কত্বের জন্যে বিভিন্ন দফতর থেকে উদ্বৃত্ত স্টাফ অফিসার তুলে আনা হয়।

জওয়ানদের অধিকাংশের কাছেই রয়েছে ৩০৩ রাইফেল। এরা যাতে অতিরিক্ত আক্রমন শক্তি লাভ করে, সেজন্য বিভিন্ন উৎস থেকে এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক, তিনটা মর্টার (৩ইঞ্চি), চারটা রিকয়েললেস রাইফেল, ৬ পাউন্ডি দুটো কামান এবং গোটা কয়েক মেশিনগান সংগ্রহ করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরন করা হয়। এইসব ভারী অস্ত্র সাধারনভাবে কালিয়াকৈর-টঙ্গী অঞ্চলে মোতায়ন, কারন ভারতীয় ছত্রী বিগ্রেড এই দিক দিয়ে হামলা চালাবে বলে আশংকা রয়েছে। সাজোয়া ও গোলন্দাজ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে গোলা বারুদের কোন অভাব ছিলনা।

লস্কর ও অস্ত্রের এই বিবরণ কাগজের উপর দেখতে বেশ ভালোই মনে হয়, কিন্তু আসলে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়। সৈন্যদের মনে বল নেই, অস্ত্রে ধার নেই, সেই অস্ত্র সেকেলে, মরচেধরা। তার চাইতে খারাপ অবস্থা হচ্ছে এই যে সৈন্যরা লড়তে আদৌ ইচ্ছুক নয়। তারা যার যার জায়গায় পুতুলের মত দাড়িয়ে থাকে-যেন একটুখানি আঘাত লাগলেই গড়িয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত।

১৩ ডিসেম্বর উত্তর সেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন বিগ্রেডিয়ার তার দূর্ভেদ্য আয়োজন দেখাবার জন্যে আমাকে টঙ্গীর দিকে নিয়ে যান। বললেন, 'দেখো, পাকা রাস্তার উপর কাটা দাগটা হচ্ছে মাইনের জন্যে। গর্তের মধ্যে এই ঠুলিটা হচ্ছে আমাদের কামানের অবস্থান। ঐযে ঐখানে টঙ্গী-ঢাকা সড়কের এইপাশে আমাদের রিকয়েললেস রাইফেল রাখা আছে। আরও উত্তরে গাছপালার ঝোপের মধ্যে রাখা আছে আমাদের ট্যাংক।'

তারপর আমরা জীপ থেকে নামলাম আরও কাছ থেকে বসপারগুলো দেখবার জন্য। রিকয়েললেস রাইফেল আছে ঠিকই কিন্তু তারজন্যে ভালো ধরনের গোলা বারুদ দেয়া হয়েছে। মর্টারে বোমা আছে বটে

কিন্তু সাইট নেই। শত্রুর বিমান আমাদের একটা কামান ধ্বংস করে দিয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় কামানটি হয়ত ধ্বংস হবার অপেক্ষায় রয়েছে। একমাত্র মেশিনগানের জন্যে রয়েছে সঠিক লোক ও সঠিক গোলাবারুদ। কুর্মিটোলা বিমানক্ষেত্রের কাছে বিগ্রেডিয়ার একজন তরুন মেজরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন বোধ হচ্ছে?'

উত্তর পাওয়ার গেলো 'ভালোই, তবে আমাদের জওয়ানরা একমাত্র মোর্টার আর দুটো মেশিনগান নিয়ে ভারতের প্রচন্ড হামলা রুখবার মত সাহস অনুভব করছেনা।'

'বাজে বোকোনা। ওদেরকে উৎসাহিত করো। যুদ্ধ কখনো অস্ত্র দিয়ে জেতা যায়না।'

ফিরে গেলাম পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের সদর দফতরে। সেখানে বিগ্রেডিয়ার বকর সিদ্দিকী ঢাকার রাস্তায় খন্ডযুদ্ধ সংগঠিত করার কথা বললেন। কেউ একজন উল্লেখ করলেন, 'নগরীর রাস্তায় কেমন করে খন্ডযুদ্ধ সংগঠিত হবে যেখানে ঝাকে ঝাকে লোক আমাদের প্রতি সর্বদা বৈরিতা পোষন করে? আপনাকে কুত্তারমত তারা তাড়া করবে। একদিক দিয়ে ভারতীয়রা আসবে মারতে, অন্যদিক দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা।' ফলে প্রস্তাবটা বাতিল করতে হয়।

শত্রুর শক্তি আর আমাদের নিজেদের সম্পদের দিকে তাকালে দেখা যাবে ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক তাসের ঘরের মত। আর খন্ডযুদ্ধের কথা যদি বলেন, সেটাতো সর্বাত্মক কৌশলগত অভিযানের অংশ নয়। সেটা হচ্ছে মগজের মধ্যে ঢুকেছে, তাই বলে দেওয়া-এর বেশি আর কিছু নয়। জানেনই তো, ডুবন্ত মানুষ খড়-কুটো পেলে তাই ধরে বাচতে চায়।

আত্মসমর্পনঃ

মেজর জেনারেল রহীম চাদপুর থেকে পালাতে গিয়ে সামান্য আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নেবার পর জেনারেল ফরমানের বাসভবনে সুস্থ হতে থাকেন। বাড়ির একটা পৃথক অংশে ফরমানের সঙ্গে থাকতেন তিনি। ১২ ডিসেম্বর, সর্বাত্মক যুদ্ধের নবম দিন। স্বভাবতই তারা দুজন তখনকার সর্বাধিক সঙ্কটপূর্ন প্রশ্নটির মধ্যে নিজেদের নিবদ্ধ রাখবেনঃ ঢাকাকে কি রক্ষা করা যাবে? তার খোলাখুলি মত বিনিময় করতেন। রহীমের স্থির বিশ্বাস যে যুদ্ধবিরতিই হচ্ছে প্রশ্নটির একমাত্র উত্তর। কিন্তু ফরমান এই উত্তর শুনে বিস্মিত হলেন। কারন তিনি সবসময় ভারতের বিরুদ্ধে প্রলম্বিত, চূড়ান্ত যুদ্ধের পক্ষে মত জাহির করে এসেছেন। একটুখানি শ্লেষের সুরে তিনি বললেন, 'এইটুকুতেই ঘাবড়ে গেলে বাছা-এত তাড়াতাড়ি?' তবু অটল রহীম বললেন, বড্ড বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় আহত জেনারেলকে দেখবার জন্যে এলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী ও মেজর জামশেদ। রহীম একই কথা বললেন নিয়াজীকেও। এতে নিয়াজীর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিলনা। তার মন থেকে তখনও হয়ত বিদেশী সাহায্যের ভরসাটুকু নিঃশেষে মুছে যায়নি। এদিকে ফরমান প্রসংগটিকে এড়িয়ে পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। জেনারেল নিয়াজী, রহীমের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে ফরমানের কামরায় গিয়ে বললেন, 'তাহলে সঙ্কেত বার্তা রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠিয়ে দাও।' শুনে মনে হল তিনি জেনারেল রহীমের পরামর্শ তিনি মেনে নিয়েছেন, যেমন শান্তিকালে সব সময় তিনি তার পরামর্শ মেনে চলতেন। জেনারেল নিয়াজী চাইলেন, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটা গভর্নমেন্ট হাউস থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হোক। ফরমান সবিনয়ে বললেন, প্রয়োজনীয় সঙ্কেত-বার্তা পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের সদরদফতর থেকেই প্রেরিত হওয়া উচিত। কিন্তু জেনারেল নিয়াজী বললেন, 'না সংকেত বার্তা এখান থেকেই যাক কি ওখান থেকেই যাক, তাতে কিছু এসে যায়না। আসলে আমার অনত্র কিছু জরুরী কাজ আছে। তুমি তাহলে এখান থেকেই পাঠিয়ে দাও।'

ফরমান না করবার আগেই মুখ্য সচিব মুজাফফর হোসেন কামরায় এলেন এবং আলোচনায় বিষয়বস্তু বুঝতে পেরে বললেন 'আপনি ঠিক বলেছেন। সঙ্কেতবার্তা এখান থেকেই পাঠানো যেতে পারে।' এভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

জেনারেল ফরমান যে জিনিষের বিরোধিতা করেছিলেন, সেটা ঠিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নয়, বরং সেই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা হবার দায়িত্ব। একই বিষয়ের উপর পাঠানো তার পূর্ববর্তী সঙ্কেতবার্তা রাওলাপিন্ডিতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বারবার তিনি লজ্জা পেতে চাননা। জেনারেল নিয়াজী চলে গেলেন তার 'জরুরী কাজ'

সম্পাদন করতে। তখন মুজাফফর হোসেন সেই ঐতিহাসিক লিপির খসড়া তৈরী করলেন। ফরমান সেটা দেখলেন এবং গভর্নরের কাছে পেশ করলেন। গভর্নর সেটা অনুমোদন করে সেই দিনই (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্টের কাছে। লিপিতে অজস্র নিরীহ প্রাণ বাচানোর জন্যে ইয়াহিয়া খানকে যথাসাধ্য করার অনুরোধ করা হল।

পরের দিন গভর্নর ও তার মুখ্য সহযোগীরা রাওলাপিন্ডি থেকে আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সম্ভবতঃ এতই ব্যস্ত ছিলেন যে তিনি সিদ্ধান্ত দেবার সময় করতে পারেননি। আরও একদিন পর (১৪ ডিসেম্বর) গভর্নমেন্ট হাউসে উচ্চপর্যায়ের সভার আয়োজন হয়েছিল এবং তখন বেলা ১১ টা ১৫ মিনিটে ৩টি ভারতীয় মিগ বিমান গভর্নমেন্ট হাউসের উপর হামলা চালায় এবং প্রধান হলঘরের বিরাট ছাদ ফাটিয়ে ফেলে। বিমান হামলার হাত থেকে বাচবার জন্য গভর্নরকে আশ্রয়ের সন্ধানে পালাতে হয় এবং তৎক্ষনাৎ তিনি পদত্যাগপত্র লিখে ফেলেন। ক্ষমতার এই পীঠস্থানের অভ্যন্তরে বসবাসকারী প্রায় সবাই বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষা পান, মারা যায় কেবল শোভাবর্ধক কাচের খাচায় রাখা কিছু নিরীহ মাছ। তারা উত্তপ্ত পাথর কুচুর মধ্যে ছটফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

১৪ ডিসেম্বর গভর্নর, তার মন্ত্রীসভা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী অসামরিক কর্মচারীরা আন্তর্জাতিক রেডক্রস কর্তক 'নিরপেক্ষ অঞ্চলে' রুপান্তরিত হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে গিয়ে আশ্রয় নেন। পশ্চিম পাকিস্তানী বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের মধ্যে ছিলেন মুখ্য সচিব, পুলিশের আইজি, ঢাকা বিভাগের কমিশনার, প্রাদেশিক সচিবগণ, আরও কয়েকজন নিরপেক্ষ অঞ্চলে প্রবেশাধিকার পেতে তারা লিখিতভাবে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কারন যুদ্ধমান রাষ্ট্রের কোন ব্যাক্তি রেডক্রসের আশ্রয় লাভর অধিকারী নয়।

১৪ ডিসেম্বর ছিল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শেষ দিন। একাধারে সরকারের ও গভর্নমেন্ট হাউসের আবর্জনা যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিল। বাংলাদেশের সীজারিয়ান জন্মকে চূড়ান্ত করবার উদ্দেশ্যে শক্রর যে কাজ বাকি ছিল তা হচ্ছে জেনারেল নিয়াজী ও তার অসংগঠিত বাহিনীসমূহকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা। এত দিনে জেনারেল নিয়াজীও বৈদেশিক সাহায্যের সব আশা হারিয়ে বসেছেন। তিনি আবার তার আগের হতাশার মেজাজ ফিরে পেয়েছেন এবং নিজের সুরক্ষিত কেবিন ছেড়ে কখনও তিনি বাইরে বের হচ্ছেননা। সময়ের রথ তিনি অনেক ছুটিয়েছেন, কিন্তু কখনও তিনি তার গতি ও লক্ষ্য নিয়ন্ত্রন করেননি।

সুতরাং তিনি প্রেসিডেন্ট তথা সর্বাধিনায়ককে আসল অবস্থা জানালেন এবং উপদেশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাতে (১৩-১৪ ডিসেম্বর) আমার সামনে তিনি জেনারেল হামিদকে টেলিফোন করে বললেন, ‘স্যার, আমি প্রেসিডেন্টের কাছে কিছু প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আপনি দয়া করে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা নেয়াতে পারেন কিনা দেখুন।’

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তথা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক তার বহুমুখী ব্যস্ততা শেষ করে সময় করতে পারলেন এবং পরের দিন গভর্নর ও জেনারেল নিয়াজীকে আদেশ করলেন ‘লড়াই বন্ধ করার জন্য

এবং জীবন রক্ষার জন্য সর্ববিধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হোক।' জেনারেল নিয়াজীর কাছে পাঠানো সঙ্কেতবার্তায় তিনি বললেনঃ

হাওয়ালা আমার কাছে প্রেরিত গভর্নরের বার্তা। প্রচন্ড প্রতিকুলতার মুখে আপনি বীরোচিত যুদ্ধ লড়েছেন। জাতি আপনার জন্য গর্বিত এবং বিশ্ব প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সমস্যার গ্রহনযোগ্য সমাধানে উপনীত হবার জন্য মানবিকভাবে যা কিছু করা সম্ভব ছিল, আমি তার সবই করেছি। এখন আপনি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছেন যেখান থেকে অধিকতর প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া মানবিকভাবে সম্ভব নয় এবং তা কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যও পূর্ন করবেনা। বরং তাতে আরো জীবন ক্ষয় হবে এবং ধ্বংশ ডেকে আনবে। লড়াই বন্ধ করার জন্য এবং সশস্ত্রবাহিনীর লোক, সকল পশ্চিম পাকিস্তানী ও অনুগত সকল ব্যাক্তির জীবন রক্ষার জন্য আপনাকে এখন প্রয়োজনীয় সর্ববিধ ব্যবস্থা নিতে হবে। এদিকে আমি পূর্ব পাকিস্তানে অবিলম্বে বৈরিতা বন্ধ করতে হবে এবং সশস্ত্রবাহিনীসমূহ ও দুষ্কৃতকারীদের হামলার লক্ষ্য হতে পারে এমন সকল ব্যাক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতকে আহবান জানাবার জন্য জাতিসংঘকে সচল করেছি।

জরুরী তারবার্তা ১৪ ডিসেম্বর ১৩টা ৩০ মিনিটে রাওলাপিন্ডি থেকে ছাড়া হয় এবং তা ঢাকায় এসে পৌছায় ১৫টা ৩০ মিনিটে (পূর্ব পাকিস্তান মান সময়)।

প্রেসিডেন্টের এই তারবার্তায় তাৎপর্য কি? এর অর্থ কি জেনারেল নিয়াজীর জন্য আত্মসমর্পনের আদেশ? নাকি চাইলে যুদ্ধ আরো চালিয়ে যাওয়া? পাঠক যদি পারেন তাহলে এর একটা অর্থোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

জেনারেল নিয়াজী ঐ দিন সন্ধ্যায় যুদ্ধবিরতীর সফলের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রথমে তিনি সোভিয়েত ও চীনা কূটনৈতিকদের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু পরে ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল মিস্টার স্পিভাককে মনোনীত করেন। জেনারেল নিয়াজী মিস্টার স্পিভাকের কাছে যাবার জন্য মেজর জেনারেল ফরমান আলীকে সঙ্গ দেবার অনুরোধ জানান। কারন ফরমান আলী গভর্নরের উপদেষ্টা হিসাবে বৈদেশিক কূটনীতিবিদদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন। তারা মিস্টার স্পিভাকের কার্যালয়ে পৌছালে ফরমান পার্শ্বকক্ষে অপেক্ষা করতে থাকেন আর নিয়াজী ভেতরে গিয়ে কথাবার্তা চালান। নিয়াজীর চড়া গলার আলাপ শুনতে থাকেন ফরমান এবং লক্ষ্য করেন যে স্পিভাকের সহানুভূতি লাভের আশায় নিয়াজী তার রূঢ় যুক্তিবা দাড় করিয়ে যাচ্ছেন। এক সময় নিয়াজীর যখন মনে হয়যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তিনি মার্কিন কনসালকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী নিয়ে আলাপ-আলোচনা বলেন। মিস্টার স্পিভাক সকল ভাবপ্রণতা পরিহার করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'আপনার পক্ষে আমি যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করতে পারিনা। তবে আপনি চাইলে আমি কেবল একটা বার্তা পাঠাতে পারি।'

ভারতের স্টাফ প্রধান (সেনাবাহিনী) জেনারেল স্যাম মানেক-শ'র কাছে পাঠাবার উদ্দেশ্যে একটা বার্তার খসড়া তৈরির জন্য জেনারেল ফরমানকে ডাকা হল। তিনি পূর্ন এক পৃষ্ঠার যে লিপি প্রস্তুত করলেন, তাতে আশু যুদ্ধবিরতির আহবান জানানো হয় নিম্নরূপ নিশ্চয়তাবিধানের শর্তসহঃ পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে অনুগত অসামরিক নাগরিকদের রক্ষা এবং অসুস্থ ও আহত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও সুচিকিৎসা।

লিপি প্রস্তুত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার স্পিভাক বললেন, 'কুড়ি মিনিটের মধ্যে এটা প্রেরিত হবে।' জেনারেল নিয়াজী ও ফরমান এডিকং ক্যাপ্টেন নিয়াজীকে উত্তরের জন্য সেখানে বসিয়ে রেখে পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডে ফিরে এলেন। তিনি রাত ১০টা পর্যন্ত বসে থাকলেন, কিন্তু কিছুই ঘটল না। তাকে বলা হল, পরে খোজ নেবেন, এখন ঘুমাতে যাব। সারারাত ধরে কোন উত্তর এলনা।

বস্তুত মিস্টার স্পিভাক ঐ বার্তা জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল) মানেক-শ'র কাছে পাঠাননি। তিনি তা পাঠিয়েছেন ওয়াশিংটনে। ওয়াশিংটনে মার্কিন সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়ার আগে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে পরামর্শের জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খানকে পাওয়া যায়নি। কোথাও তিনি দুঃখ ভুলবার চেষ্টা করছিলেন। পরে আমি জানতে পারি, সেই ৩ ডিসেম্বর তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহহীন হয়ে পড়েন এবং তার পর থেকে তিনি কখনো আর নিজের কার্যালয়ে আসেননি। সাধারণত তার সামরিক সচিব সর্বশেষ যুদ্ধ পরিস্থিতিচিহ্নিত একটা মানচিত্র নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যান। কখনও কখনও এই মানচিত্র তিনি দেখেন এবং একবার তিনি বলেন, 'এই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমার কীইবা করার থাকতে পারে?'

১৫ ডিসেম্বর মানেক-শ যে উত্তর দেন, তাতে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী যদি আমার অগ্রসরমান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে, তাহলে যুদ্ধবিরতী গ্রহণ করা হবে, এবং লিপিতে উল্লেখিত কর্মচারীদের নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে।' খুটিনাটি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের আসন কলকাতায় একটি বেতার তরঙ্গও প্রদান করেন।

মানেক-শ'র জবাব রাওলাপিন্ডি পাঠানো হল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ যে উত্তর পাঠান, তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল, 'আমার পরামর্শ হচ্ছে, তারা যখন তোমাদের চাহিদা পূরণ করছে, তখন তোমরাও এইসব শর্তে যুদ্ধবিরতি মেনে নাও।...অবশ্য এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি যদি জাতিসংঘ কর্তৃক দেয় সমাধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন না হয়, তাহলে এটা বাতিল ও অপ্রযোজ্য বলে গণ্য হবে।'

১৫ ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৫টা থেকে পরের দিন বেলা ৯টা পর্যন্ত অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এর মেয়াদ ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৩টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়, যেন যুদ্ধবিরতির শর্তগুলি চূড়ান্ত করবার জন্য সময় পাওয়া যায়। জেনারেল হামিদ যখন নিয়াজীকে যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়ার পরামর্শ দেন, তখন নিয়াজী সেটাকে অনুমোদিত বলে মনে করেন এবং তার স্টাফ বিগ্রেডিয়ার বকরকে সৈন্য-পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতে বলেন। পূর্ন এক পৃষ্ঠাজুড়ে লেখা সংকেতবার্তায় সৈন্যদের বীরোচিত লড়াই এর প্রশংসা করা হয় এবং স্থানীয় অধিনায়কদের ভারতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়, যাতে যুদ্ধবিরতির আয়োজন করা যায়। এতে 'আত্মসমর্পণ' শব্দটি ব্যবহত হয়নি। বলা হয়, 'দূর্ভাগ্যবশত' অস্ত্রসশত্র ত্যাগ করার বিষয়টিও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

সংকেতবার্তাটি যখন পাঠানো হয় তখন মধ্যরাত্রি (১৫-১৬ ডিসেম্বর)। একই সময়ে ৪ বিমান চলাচল স্কোয়াড্রনের অফিসার কম্যান্ডিং লেফটেন্যান্ট কর্নেল লিয়াকত বুখারীকে সর্বশেষ শলা-পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। তাকে সেই একই রাতেরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেতর দিয়ে আকাশ পথে বার্মার আকিয়াবে আটজন পশ্চিম পাকিস্তানী সেবিকা ও আঠাশটি পরিবারকে পাঠিয়ে দিতে বলা হয়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল লিয়াকত যুদ্ধকালের মতই স্বাভাবিক ও শান্তভাবে এই আদেশ মানেন। ১২ দিনের সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রতিটি দিনে

তার হেলিকপ্টারগুলো ছিল পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড থেকে সর্বাধিক দূর্দশাগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকায় লোক ও অস্ত্রসশস্ত্র পাঠাবার জন্য লভ্য একমাত্র মাধ্যম। তাদের এই অপরিমেয় বীরত্বের কথা এখানে অল্প কথায় ব্যক্ত করা যাবেনা।

১৬ ডিসেম্বরের খুব ভোরে দুটি এবং প্রকাশ্যে দিবালোকে আরও একটি হেলিকপ্টার রওয়ানা হয়ে যায়। এতে ছিলেন মেজর জেনারেল রহিম খান এবং আরও কয়েকজন। কিন্তু সেবিকাদের তাদের হোস্টেল থেকে ‘সময়মত সংগ্রহ করা যায়নি’ বলে তাদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সবকটি হেলিকপ্টার বার্মায় নিরাপদে অবতরন করে এবং যাত্রীরা পরে করাচী পৌছে যান।

আবার ঢাকা, এবং সেই দূর্ভাগ্যজনক মুহূর্তটি অতি নিকটবর্তী। টাঙ্গাইল থেকে এগিয়ে আসা শত্রুবাহিনী যখন টঙ্গীর কাছাকাছি এসে পৌছায় তখন আমাদের ট্যাংকবহরের গোলা দিয়ে তাদের স্বাগত জানানো হয়। টঙ্গী ঢাকা সড়ক সুরক্ষিত মনে করে তারা পার্শ্ববর্তী পরিত্যক্ত রাস্তা ধরে মানিকগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। ৬ ডিসেম্বর কর্নেল ফজলে হামিদ খুলনা থেকে যেমন সরে গিয়েছিলেন, এই মানিকগঞ্জ থেকেও তিনি ঠিক তেমনিভাবে আগেই সরে গিয়েছিলেন। ফজলে হামিদের বাহিনীর অনুপস্থিতির জন্য শত্রুবাহিনী অতিসহজেই উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঢাকায় প্রবেশের সুযোগ লাভ করে।

ঢাকার সেনানিবাস ছাড়া গোটা প্রাদেশিক রাজধানীর রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিগ্রেডিয়ার বশীর ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জানতে পারেন যে, মানিকগঞ্জ-ঢাকা সড়ক সম্পূর্ন অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। সেই রাত্রির প্রথম অর্ধেক তিনি প্রায় এক কোম্পানীর সমান ই পি সি এ এফ-এর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকজনদের জোগাড় করতে পাঠিয়ে দেন এবগ্ন এদের মীরপুর সেতুর কাছে ঠেলে দেন মেজর সালামতের তত্বাবধানে। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মুক্তিবাহিনী খবর দিয়ে রেখেছিল যে সেতুটি অরক্ষিত অবস্থায় আছে, তাই তাদের ঝটিকা বাহিনী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রির দিকে ঢাকা নগরীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ততক্ষনে মেজর সালামতের জওয়ানরা সেখানে অবস্থান নিয়ে ফেলেছে এবং তারা অগ্রসরমান শত্রুবাহিনীর দিকে অন্ধের মত গুলী ছুড়তে থাকে। তারা বেশ কয়েকজন শত্রুসৈন্যকে নিহত এবং দুটি ভারতীয় জীপ আটক করে বলেও দাবী জানায়।

এদিকে অগ্রসরমান ঝটিকা বাহিনীর পিছনেই আসছিলেন ১০১ যোগাযোগ অঞ্চলের মেজর জেনারেল নাগরা। তিনি মীরপুরে সেতুর পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থান নেন এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীর কাছে একটি চিরকুট লিখে পাঠান। এতে বলা হয়, ‘প্রিয় আব্দুল্লাহ, আমি মীরপুর সেতুর কাছে আছি। আপনার প্রতিনিধি পাঠান।’

সকাল ৯টার দিকে জেনারেল নিয়াজী যখন চিরকুটটি পান, তখন মেজর জেনারেল জামশেদ, মেজর জেনারেল ফরমান ও রিয়ার এডমিরাল শরীফ তার সঙ্গে ছিলেন। ফরমান তখনও যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত বার্তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই (নাগরা) কি আলোচনাকারী দলের লোক?’ জেনারেল নিয়াজী এর কোন উত্তর দেননি। কঠিন প্রশ্ন সামনে এসে দাড়ালঃ একে কি স্বাগত জানানো হবে, না প্রতিরোধ করা হবে?

মেজর জেনারেল ফরমান নিয়াজীকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার কি কোন রিজার্ভ সৈন্য আছে?’ নিয়াজী এবারও কিছু বললেন না। রিয়ার এডমিরাল শরীফ পাঞ্জাবী ভাষায় বললেন, ‘শুনছ, ও জানতে চাছে

তোমার ঝোলায় কি কিছু আছে?' নিয়াজী ঢাকা নগরীর রক্ষক জামশেদের দিকে তাকালেন এবং ডাইনে বায়ে এমনভাবে মাথা নাড়ালেন যার অর্থ হচ্ছে 'কিছুই নেই।' তখন ফরমান ও শরীফ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'তাহলে যাও, গিয়ে সে (নাগরা) যা বলে তাই তামিল কর।'

জেনারেল নিয়াজী, মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠালেন নাগরাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। মীরপুর সেতুতে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যদের তিনি বললেন যুদ্ধবিরতির প্রতি মর্যাদাবান থাকতে এবং নাগরাকে শান্তিপূর্নভাবে ভেতরে আসবার ব্যবস্থা করে দিতে। ভারতীয় জেনারেল অল্প কয়েকজন সৈনিক আর বুকভরা গর্ব নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করলেন। এইভাবে ঢাকা নগরীর প্রকৃত পতন সংগঠিত হল।

ঢাকার পতন হল অত্যন্ত শান্তভাবে, ঠিক যেমন হার্টের রুগীর হয়। না কোন অঙ্গহানি হল না, না একটু আঘাত লাগল গায়ে। যা ছিল স্বাধীন নগরী, এক মূহুর্তের ব্যবধানে তা এখন পরাধীন। সিঙ্গাপুর, প্যারিস কিং বার্লিনের পতনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানে হয়নি।

এদিকে পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের রণকৌশলগত সদরদফতর গুটিয়ে ফেলা হল। অভিযান পরিচালনা সম্পর্কিত সব মানচিত্র সরিয়ে ফেলা হল। ভারতীয়দের স্বাগত জানাবার জন্য প্রধান সদরদফতর ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করা হল এবং ব্রিগেডিয়ার বকর বললেন, 'একে এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।' সংলগ্ন অফিসারস মেসকে আগে থেকে সাবধান করে দেওয়া হল 'মেহমানদের জন্য' অতিরিক্ত খাদ্য প্রস্তুত রাখার জন্য। কেতারদুরস্ত প্রশাসনের জন্যে বকরের জুড়ি মেলা ভার।

দুপুরের অল্প পরে ব্রিগেডিয়ার বকর বিমানবন্দর গেলেন তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ মেজর জেনারেল জ্যাকভকে অভ্যর্থনা জানারে। এদিকে নিয়াজী নাগরার সঙ্গে রসিকতায় মেতে উঠলেন। সেই রসিকতার ভাষাগুলি মনে রাখিনি বলে ক্ষমাপ্রার্থী, এবং সেগুলো ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করারও যোগ্য নয়।

মেজর জেনারেল জ্যাকভ 'আত্মসমর্পণের দলিল' এনে হাজির করলেন জেনারেল নিয়াজী এবং তার স্টাফপ্রধান যেটাক খসড়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি নামে অভিহিত করা শ্রেয়ঃ বলে মনে করলেন। জ্যাকভ কাগজপত্র বকরের কাছে হস্তান্তর করলেন, বকর আবার তা মেজর জেনারেল ফরমানের সামনে রাখলেন। দলিলের যে দফায় লেখা আছে, 'ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ কম্যান্ড,' সেই দফায় উপর জেনারেল ফরমান আপত্তি তুললেন। জ্যাকভ বললেন, 'কিন্তু দিল্লী থেকে তো এটা এইভাবেই এসেছে।' একপাশে দাঁড়ানো ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল খেরা ফোড়ন কাটলেন, 'আরে দাদা এটাতো ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যকার অভ্যন্তরীন ব্যাপার। আসলে আপনারা কেবল ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করছেন।'

দলিলটা এরপর নিয়াজীর কাছে ঠেলে দেওয়া হয় এবং তিনি একনজর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটাকে টেবিলের অন্য পাশে ফরমানের দিকে ঠেলে দেন। ফরমান বললেন, 'গ্রহন করা হবে কি হবেনা তা অধিনায়কদের ব্যাপার।' নিয়াজী কিছুই বললেন। এর অর্থ হচ্ছে যে তিনি সেটা মেনে নিলেন।

দুপুর গড়িয়ে গেলে জেনারেল নিয়াজী মোটরযোগে ঢাকা বিমানবন্দরে যান ভারতের পূর্বাঞ্চল কম্যান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিত সিং অরোরাকে অভ্যর্থনা জানারে। তিনি সস্ত্রীক হেলিকপ্টারযোগে পৌছালেন। বহু বাঙ্গালী জনতা তাদের এই ত্রানকর্তা ও তার স্ত্রীকে মাল্যভূষিত করার জন্যে যেন প্রতিযোগিতায় নামলেন। নিয়াজী তাকে সামরিক অভিবাদন জানালেন এবং করমর্দন করলেন। সে এ

মর্মস্পর্শী দৃশ্য। বাঙ্গালীরা একসঙ্গে বিজেতা ও বিজিতকে বুক ভরে দেখবার সুযোগ লাভ করেন এবং তারা অরোরা ও নিয়াজীকে যথাক্রমে পরম ভালবাসা ও চরম ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে দেখবার মানসিকতাটা গোপন করেননি।

তুমুল হৈ-হল্লা ও শ্লোগানের মধ্য দিয়ে তারা মোটর যোগে রমনা রেস কোর্সে (সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে) যান। সেখানে আত্মসমর্পনের অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্যে মঞ্চ আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জনতার ভিড়ে সারা মাঠ গমাগম করছিল। একজন পশ্চিম পাকিস্তানী জেনারেলের প্রকাশ্য লাঞ্ছনা দেখবার জন্যে তারা সবাই ছিল অত্যন্ত উদগ্রীব। একই সঙ্গে নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মেরও উপলক্ষ ছিল সেটা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ছোট একটি দল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বিজেতাকে সম্মানসূচক অভিবাদন জানাবার জন্যে। অন্যদিকে ভারতীয় সৈনিকদের একটি দল বিজিতকে পাহারা দিতে থাকে। আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দেন নিয়াজী। আনুমানিক ১০ লাখ বাঙ্গালী এবং বহু বিদেশী সাংবাদিক এই দৃশ্য পূর্নমাত্রায় দেখবার সুযোগ লাভ করেন। তারা দুজন উঠে দাড়ান। জেনারেল নিয়াজী তার রিভলভার বের করে অরোরার হাতে সমর্পন করেন ঢাকা নগরীকে সমর্পনের নিদর্শনস্বরুপ। অর্থ্যাৎ সেই সঙ্গে সমর্পন করা হয়ে গেল গোটা পূর্ব পাকিস্তানকে।

ঢাকা গ্যারিসনকে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে তাদের ব্যাক্তিগত অস্ত্রসশ্ত্র নিজেদের কাছে রাখতে দেওয়া হয়। স্থির হয় যে, যথেষ্ট সংখ্যায় ভারতীয় বাহিনী নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্যে এসে না পৌছানো পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। এই গ্যারিসন ১৯ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় সেনানিবাসের গলফ মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করে। ঢাকার বাইরে অবস্থিত সৈন্যরা স্থানীয় অধিনায়কদের ব্যবস্থাপনায় ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে সুবিধামত তারিখে তাদের অস্ত্র ত্যাগ করে।

অল-ইন্ডিয়া রেডিও সেই কোন ১৪ ডিসেম্বর থেকে আত্মসমর্পণের খবর সম্প্রচার করতে শুরু করে দেয়। এই সম্প্রচার ঢাকা ও অন্যান্যস্থানের অবাঙলী জনসংখ্যাকে আতঙ্কিত করে তোলে। তাদের অনেকি পাকিস্তানি সৈনিকদের দূর্ভাগ্যের অংশীদার হবার জন্যে নিজেদের ঘড়বাড়ি ছেড়ে সেনানিবাসের দিকে অগ্রসর হয়। এইরকম হাজার হাজার অবাঙ্গালী মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মৃতুবরন করে। এইসব নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী আমি শুনেছি। মানুষের বুকের রক্ত হিম করে দেওয়ার মতো এসব কাহিনী এই স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করে শেষ করা যাবেনা।

এইসব নিরীহ লোকদের বাচাবার মত সময় ভারতীয়দের ছিলনা। তারা তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল বিজয়-উত্তর লুটের মাল ভারতে পাচার করতে। বড় বড় ট্রেন আর সারিবদ্ধ ট্রাক বোঝাই করে সামরিক সরঞ্জাম, খাদ্যসামগ্রী,শিল্পপন্য এবং রেফ্রিজারেটর গালিচা ও টেলিভিশন সেটসহ বহু গাহর্স্থ্য সামগ্রী। ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের রক্ত নিঃশেষে এমনভাবে শুষে নেয়া হয়যে নতুন স্বাধীনতার উষালগ্নকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে পড়ে থাকে শুধু একটা খোলস। এক বছর পর এই উপলব্ধি সাড়া জাগিয়েছিল বাঙালীদের চেতনায়।

ভারতীয়রা বাংলাদেশের সম্পদ যত পেরেছে নিজেদের রাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়ে যাবার পর ভারতের বিভিন্ন যুদ্ধবন্দি শিবিরে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের স্থানান্তরিত করতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়া চলতে

থাকে ১৯৭২ সালের শেষ পর্যন্ত। অবশ্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী, মেজর জেনারেল ফরমান, রিয়ার এডমিরাল শরীফ, এয়ার কমোডর ইনামুল হকসহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের তারা ২০ ডিসেম্বর বিমানযোগে কলকাতা নিয়ে যায়। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম।

২০ ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৩টা ৩০ মিনিটে আমি যখন শেষবারের মত ঢাকা বিমানবন্দর ত্যাগ করলাম, তখনকার সেই ঢাকা ১৯৭০এর জানুয়ারীতে আমি যখন প্রথম এখানে নামি তখনকার ঢাকার চাইতে কত পৃথক। পাকিস্তানি সৈন্যের থাকীর জায়গায় স্থান করে নিয়েছে সবুজবেশী সৈন্যরা। ভারতীয় সবুজ পোশাক। বাঙ্গালীরা সেই একি জায়গায় রেলিং এ বসে অবাক হয়ে পরিবর্তন দেখছে। এই পরিবর্তন তাদের হতবুদ্ধি করে তুলল যে পরিবর্তন হয়ত ভবিষ্যতে একদিন তাদের আরও শোচনীয় আধিপত্যের নিগড়ে আবদ্ধ করবে। তবে কি তারা কেবল জোয়াল পরিবর্তন করল?

পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে কোন তদন্ত কমিশনের সামনে যখন জেনারেল নিয়াজীর হিসাব বুঝিয়ে দেবার সময় বা প্রয়োজন দেখা দিবে, তার আগেই কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে পৌছাবার পরপরই আমি তার সঙ্গে বসে যুদ্ধের আনুপূর্ব পরিস্থিতি আলোচনার সুযোগ নিলাম। তিনি আলাপ করলেন স্পষ্টভাবে ও তীর্যকভাবে। তার কথায় কোন অনুতাপ বা বিবেকের দংশন ছিলনা। পাকিস্তান ভাঙ্গনের জন্যে কোন রকনের দায়িত্ব মেনে নিতে তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং সব দোষ চাপালেন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উপর। আমাদের আলাপের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কখনও কি আপনি ইয়াহিয়া খান বা হামিদকে জানিয়েছেন যে, যে সম্পদ আপানাকে দেওয়া হয়েছে, আপনার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্যে তা যথেষ্ট নয়? তারা কি বেসামরিক নাগরিক যে এসব জানেন না? তারা কি জানেন না যে ঘরে বাইরে বিদ্যমান বড় বড় বিপদের মুখে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করবার ব্যাপারে তিনটা পদাতিক ডিভিশন যথেষ্ট নয়? আপনি যাই বলুন না কেন, ঢাকাকে রক্ষার ব্যাপারে আপনার অক্ষমতা রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে আপনার বিরুদ্ধের একটা কলংক হয়ে থাকবে। পরিস্থিতি অনুযায়ি এমনকি দূর্গে বসে থেকে প্রতিরক্ষা যদি একমাত্র সম্ভাব্য মতবাদ হয় তবে বলব, আপনি ঢাকা দূর্গ করে গড়ে তোলেন নি। ঢাকায় কোন সৈন্য ছিলনা।'

উত্তরে নিয়াজী বললেন, 'এজন্য রাওয়ালপিন্ডি দায়ী তারা আমার কাছে নভেম্বরের মাঝামাঝি ৮টা পদাতিক ব্যাটালিয়ন পাঠাবে বলে কথা দিয়েছিল, কিন্তু পাঠায় মাত্র ৫ ব্যাটেলিয়ন। পশ্চিম পাকিস্তানে রণাঙ্গন খুলে গেল বলে আমাকে আগেভাগে না জানিয়ে বাকি ৩টা ব্যাটেলিয়ন পাঠানো বন্ধ রাখা হল। অথচ আমি এই অবশিষ্ট ৩ ব্যাটেলিয়ন সৈন্য ঢাকায় মোতায়েন করতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু ৩ ডিসেম্বর আপনি যখন জানতেন যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর বেশি কিছু আসবেনা, তখন আপনি আপনার নিজস্ব সম্পদ থেকে কেন সঞ্চয় ভান্ডার গড়ে রাখেন নি?'

'কারন একসঙ্গে সব সেক্টরের উপর প্রবল চাপ এসেছিল। সব সেক্টরের জন্যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সৈন্য পাঠানো হবে বলে। অথচ একটাও সৈন্য পাঠানো হয়নি।'

আমি পরামর্শ দিলাম, 'ঢাকাতে আপনার অল্পস্বল্প যা কিছু ছিল তাই দিয়ে আপনি আরও কয়েকদিন অন্তত যুদ্ধটা প্রলম্বিত করতে পাড়তেন।'

তিনি উত্তর দিলেন, ‘কিসের জন্য? তাতে তো আরও বেশি মৃত্যু, আরও বেশি ধ্বংস ডেকে আনা হত। ঢাকার সব নর্দমা ভরে যেত। সব রাস্তায় লাশ আর লাশ স্তুপীকৃত হয়ে থাকত। পৌর সুযোগ সুবিধা বলতে কিছুই থাকত না। মহামারীতে দেশ ছেয়ে যেত। তারপরেও পরিনতি একি হত। আমি বরং ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়াকে বেশি ভাল বলে মনে করব ৯০ হাজার বিধবা আর ৫ লক্ষ এতিম শিশু নিয়ে যাওয়ার চাইতে। এই আত্মত্যাগ হত কত অলাভজনক।’

‘যদিও সমাপ্তিটা হত একই ধরনের, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইতিহাস হত ভিন্ন রকমের। তখন পাকিস্তানের ইতিহাস হত ভিন্ন রকমের। তখন সামরিক তৎপরতার ইতিহাসে সেটা লেখা হত উৎসাহব্যাঞ্জক একটা অধ্যায় হিসেবে।’

জেনারেল নিয়াজী এর কোন উত্তর দেননি।

ভাষান্তরঃ নেয়ামাল বসির/সিরাজুল ইসলাম কাদির/সৈয়দা নাজমা ওয়াহিদ।